গল্পে আঁকা সীরাত

হে মুহাম্মদ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

গল্পে আঁকা সীরাত
হে মুহাম্মদ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

উৎসর্গ

তুমি শিশু?
তুমি কিশোর?
তুমি নবীন?
তাহলে অবশ্যই তুমি গল্প-প্রেমিক!
কিন্তু আমি জানি,
পাশাপাশি তুমি ভীষণ অসহায়!
কেননা, বাঘ-ভল্লুক-শৃগাল-বিড়াল ও ভূত-পেত্নীর
জীবাণুযুক্ত গল্প-কাহিনী ছাড়া পড়ার মতো তেমন
কিছুই তোমার হাতের নাগালে পাচ্ছো না।
গঠনমুখী, জীবন-বদলানো শিশু-সাহিত্যের
অনুপস্থিতিতে এইসবই কিলবিল করছে তোমার
চারপাশে। কখনও 'বিষ' ঢেলে দিচ্ছে তোমার মাঝে!
না, এ জন্যে দায়ী তুমি না— দায়ী আমরা।
বন্ধু, এ দায়বোধ থেকেই **'গল্পে আঁকা সীরাত'** এর
জন্ম।
তোমার জন্যেই এর জন্ম!
সুতরাং তোমার জন্যেই তা নিবেদিত।
এবার ছুটে এসো, **'গল্পে আঁকা সীরাত'**-এর দিকে।
হাতে তুলে নাও আদর করে।
বুকে চেপে ধরো কিছুক্ষণ, পড়ার আগে।
তারপর চীৎকার করে বলে ওঠো—
পেয়েছি!
এখন গল্পে গল্পে আমার নবীকে ভালোবাসবো—
গভীর ভালোবাসা!

-ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

সূচীপত্র

আমার পরিচয়

আমি একটি বই। বই হতে পেরে আমি খুশি, ভীষণ খুশি। আমার বিশ্বাস; এ পৃথিবীতে আমি দামী, অনে-ক দামী। আমার পাতাগুলো মূল্যবান, অনে-ক মূল্যবান। টাকা-পয়সা, সোনাদানা, রাজ-রাজড়াদের আলিশান বালাখানা এমনকি সারা পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার থেকেও আমি অনে-ক দামী। বলতে পারো, কেনো আমি এতো দামী? কেনো আমার এতো মূল্য? সে কথা বলতেই তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি! শোনো, আমি মূল্যবান তিন কারণে—

এক.

আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্যে কী পাঠিয়েছেন? কিতাব—আসমানী কিতাব। যেমন তাওরাত একটি আসমানী কিতাব, ইঞ্জিল একটি আসমানী কিতাব, যাবুর একটি আসমানী কিতাব এবং আমাদের কুরআন একটি আসমানী কিতাব। সেই সব মহান আসমানী কিতাবকে যেমন 'কিতাব' বলা হয়, আমাকেও মানুষ 'কিতাব' বলে! আসমানী হওয়ার মহিমা আমার ভাগ্যে জোটে নি, কিন্তু নাম-অবয়বের এ-সাদৃশ্যটুকু তো জুটেছে! এ-ই বা কম কিসে?

দুই.

দ্বিতীয় কারণ হলো, কুরআন নাযিল হয়েছে যাঁর প্রতি আমি রচিত সেই মহামানবকে নিয়ে, সেই আল-আমীনকে নিয়ে, মরু-মক্কার সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে, আল্লাহ যাঁকে এ-পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সবার হিদায়াতের জন্যে। সবাইকে সত্য ও কল্যাণের পথে এবং ভালোবাসা ও শান্তির পথে ডাকার

জন্যে। দুনিয়ার কাঁটাবন থেকে উদ্ধার করে আখেরাতের 'ফুলবন'-এর সন্ধান দেয়ার জন্যে। আমার গুরুত্বের অন্য সব কারণ বাদ দিলেও শুধু এ কারণেই তো আমি গর্ব করতে পারি নিজেকে নিয়ে—ঈর্ষণীয় গর্ব!

তিন.

আমার গুরুত্বের তৃতীয় কারণ হলো, আমি কচিকাঁচা ও সোনামণিদের জন্যে রচিত! ওরা আমার ভীষণ প্রিয়! প্রিয় তো হবেই! ওরা যে পবিত্র, চিরসুন্দর! যেনো শিশির-ধোওয়া ফুল, কিংবা তার মিষ্টি মধুর স্নিগ্ধ হাসি! ওরা আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয়, আল্লাহ্‌র কাছে যিনি প্রিয়, সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছেও প্রিয়। তাই আমার কাছেও প্রিয়! ভীষণ প্রিয়!!

✸ ✸ ✸

আমার পাতায় পাতায় বর্ণিত হয়েছে যে সব ঘটনা ও কাহিনী, তা আগাগোড়া সত্য। যদিও তা উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুর যবানিতে (ভাষায়)। আর আমার কচিকাঁচা বন্ধুরা তো ওদের মুখে গল্প শুনতেই বেশী পছন্দ করে, নয় কি? আবার বলছি; আমাকে সাজানো হয়েছে কুরআন-হাদীসসহ বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থ মন্থণ করে—

নতুন ভাষায় ..

নতুন ধারায় ..

নতুন ভঙিতে ..

নতুন উপস্থাপনায়।

আমার বিশ্বাস; কচিকাঁচা ও শিশু-কিশোর বন্ধুরা ভীষণ মজা করে ও গুরুত্ব দিয়ে আমাকে পড়বে এবং পড়তে পড়তে আনন্দ-বিহ্বল হয়ে পড়বে। আমার ভয়, ওরা আবার নাওয়া-খাওয়া ভুলে না যায়!

✸ ✸ ✸

আমি বিশ্বাস করি; আমার বন্ধুরা এ-বই একবার পড়লে আবার পড়তে চাইবে। বারবার পড়তে চাইবে, পড়তে বাধ্য হবে। কেননা এ বইয়ে ছড়িয়ে আছে আকর্ষণ,

বিপুল আকর্ষণ! আমি আরো বিশ্বাস করি; এ-বই পড়লে প্রিয় নবীজীকে ওরা ভালোবাসবে— হৃদয়-মন উজাড় করে! বাসবেই!! আর এ ভালোবাসার 'সোনার তরীতে' চড়েই ওরা পার হয়ে যাবে এই দুনিয়ার জীবনের স-ব সাগর মহাসাগর— একেবারে নির্বিঘ্নে, নির্ঝঞ্ঝায়, হোক তা যতোই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ও ফেনিলোত্তাল। আর ওপারে, মানে আখেরাতে এ-ভালোবাসার 'বোরাকে' চড়েই দাঁড়াবে গিয়ে ওরা একেবারে হাউযে কাউসারের পাড়ে—প্রিয় নবীজীর কাছটি ঘেঁষে, তাঁকে ভালোবাসার অধিকার নিয়ে!! আহা! সে হবে কী মধুলগ্ন! হোক তা আমাদের সবার মধুস্বপ্ন!!

* * *

হ্যাঁ.. বিদায়ের আগে আরেকটা কথা না বললেই নয়! আমাকে আরবী রূপ দিয়েছেন আরব জাহানের ইসলামী শিশু-সাহিত্যের তারকা-লেখক আবদুত তাওয়াব ইউসুফ। আর বাংলা রূপ দিয়েছেন ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী। তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভীকে আলাদা করে আবারও ধন্যবাদ। কেননা বাংলাভাষীদের হাতে তিনিই আমাকে এই প্রথম তুলে দিয়েছেন। এ সুবাদে এখন কতো বন্ধু হবে আমার! আমার জন্য এ এক বিরাট সৌভাগ্য।

আরব বিশ্বে আমার বন্ধু সংখ্যা কতো, জানো? অনেক! সত্তর লাখ! অর্থাৎ সত্তর লাখ পাঠকবন্ধুর হাতে আমি পৌঁছে গেছি এখন পর্যন্ত!

আশা করি, বাংলা ভাষার প্রিয় পাঠকরাও আমার বন্ধু হবে এখন একে একে, অনেক!

হে আল্লাহ! লেখক ও অনুবাদকের পরিশ্রম ও সাধনা তুমি কবুল করো, তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করো। আমীন!

এখন শুরু হয়ে যাক তাহলে—

উল্টাতে থাকো আমার পৃষ্ঠাগুলো, একের পর এক!

কুড়াতে থাকো ফুল— নবুওত উদ্যান থেকে, একের পর এক!

গাঁথতে থাকো মালা .. সাজাতে থাকো জীবন— আমার তোমার সবার, একের পর এক!

আমি আবরাহার হাতি

হাতি মানেই তো সাদা বাঁকানো দু'টি দাঁতের মাঝখান দিয়ে নিচের দিকে নেমে-যাওয়া ইয়া লম্বা একটা শুঁড়। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমারও অমন একটা শুঁড় আছে। আমি ঠিক বুনো হাতি নই। চিড়িয়াখানার অসহায় বন্দিত্বও কখনো আমাকে 'বরণ' করতে হয় নি। বয়সটা আমার নেহাত কম নয়, অনেক দিন ধরেই বেঁচে আছি। সবাই আমাকে একডাকে চেনে, আমি-যে আবরাহার হাতি! জগত-জোড়া আমার খ্যাতি। সবচে' বেশী নামডাক আমার যুদ্ধের ময়দানে। সেখানে আমি মহাত্রাস। প্রলয়ঙ্করী ঝড়। মুহূর্তেই সবকিছু তছনছ করে দিই। আমার শুঁড়টা যেনো ধ্বংস-তাণ্ডবের দ্বিতীয় নাম।

হ্যাঁ আমি আবরাহার হাতি। কিন্তু কী করে আমি আবরাহার হাতি হয়ে গেলাম? কেমন করে আফ্রিকার বন থেকে ধৃত হয়ে তার হাতে এসে পড়লাম? তারপর আমার জীবনে এবং আবরাহার জীবনে কী ঘটলো? সে এক শ্বাসরুদ্ধকর মজার কাহিনী! শোনাতে চাই তোমাদেরকে সেই কাহিনী— চাঁদনি রাতের দাদির গল্পের আসরের মতো গল্পময় করে। শুরু করবো? ... শোনো তাহলে—
হাবশা'র নাম শুনেছো? সেখানেই আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেখানকার বন-বাদাড় আর ঘন নিবিড় গাছ-গাছালির ছায়া ও 'মায়া'য় আমার সময় বেশ কেটে যাচ্ছিলো। 'প্রয়োজন' পড়লে মাঝে মাঝে লোকালয়েও হানা দিতাম।

একদিন আমি মনের সুখে বনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, একদল সশস্ত্র সৈন্য আমার পিছু নিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি বাঁচতে পারলাম না, শেষমেষ

ওরা আমাকে ধরে ফেললো। আমার উপর কেনো ওদের বদ-নজর পড়লো প্রথমে বুঝতে পারি নি। কিন্তু যখন বন্দির মতো ওরা আমাকে টানতে টানতে আবরাহার সামনে নিয়ে হাজির করলো, তখন আর বুঝতে বাকি রইলো না, ওরা আমার কাছে কী চায়। আমি বুঝে ফেললাম ওরা আমাকে 'বন্য-হাতি' থেকে 'সৈন্য-হাতি' বানাতে চায়। নিজের অজান্তেই আমার চোখ দু'টি ছলছল করে উঠলো! স্বাধীনতা হারানোর বেদনায় বুক ফেটে আমার কান্না আসতে চাইলো! হায়, এ কী হয়ে গেলো! আর কি ফিরে পাবো না অবাধ অরণ্য-স্বাধীনতা? বন-বনানী'র মুক্ত ঘোরাফেরা? বনের সবুজ কোলে তার শীতল ছায়ায় কী দারুণ ছিলো আমার জীবন। কিন্তু নিমেষেই কী ঘটে গেলো। আমি ভাবতেও পারি নি, আমার জীবন হয়ে যাবে অমন আবদ্ধ। শুধু কি আবদ্ধ, একেবারে কাটায়-কাটায় মাপা সৈনিক জীবন। একঘেয়ে। নিষ্ঠুর। পাষাণেঘেরা।

আমাকে সৈন্য বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ আছে। গায়ে-গতরে যেমন বিশাল আমি শক্তি-সামর্থ্যেও অতুলনীয় আমি। তাই বন্য হয়েও আমি হয়ে গেলাম সৈন্য। মানুষ সৈন্যের মতো হাতি সৈন্য। শুধু তাই নয়; আমিই হয়ে গেলাম একদল হাতি সৈন্যের সেনাপতি। আমার কথায়, আমার ইশারায় অন্যসব হাতি— এই খাড়া, এই বসা।

বনের ছায়ায় আমার মনটা বেশ কোমল ছিলো। কিন্তু আবরাহার 'ছায়ায়' আমি ক্রমেই 'দানব' হয়ে উঠছিলাম। সবাই আমাকে জমের মতো ভয় করতো। আমি আসছি শুনলেই থরথর করে কাঁপতে থাকতো। কারণ আছে। যে দিকে যেতাম ধ্বংস ছড়িয়ে যেতাম। অর্থাৎ আশ্‌পাশ ও পায়ের নিচের সবকিছু বরবাদ করে চলে যেতাম, মানুষের সাজানো জীবন ও পরিবেশ তছনছ করে ফেলতাম ।

✹ ✹ ✹

যাই হোক; আবরাহা আমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি। কিন্তু আমি একটুও খুশি হতে পারি নি। তবু মনিব হিসাবে বাইরে বাইরে তাকে শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিলো না। এদিকে হাবশায় কিছুদিন কাটতে-না-কাটতেই আবরাহা ইয়েমেন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। এ-অভিযানে বিজয়লাভ করতেই হবে। তাই আবরাহা আমাকে ব্যবহার করলো। আর আমিও আমার 'তাণ্ডব' দেখালাম। আমার নিজস্ব সৈন্যবল নিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ফলাফল যা হবার তাই হলো। ইয়েমেন-সম্রাট নিহত হলো। ইয়েমেনের জনতার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটলো। তারপর আবরাহা নিজেই বনে গেলো ইয়েমেনের স্বঘোষিত বাদশা।

ইয়েমেন দখলের পর আমার আর স্বদেশভূমি—হাবশায় ফেরা হয় নি। মাঝে মাঝেই হাবশার জন্যে মনটা আঁকু-পাঁকু করতো।
স্বদেশকে কার-না মনে পড়ে?
স্বদেশকে কে-না ভালোবাসে?
কিন্তু জালিম আবরাহার কাছে স্বদেশ প্রেমের কী মূল্য আছে?
তার কাছে মূল্য শুধু ক্ষমতার .. শুধু দম্ভের!
শুধু কেড়ে নেয়ার!

আমি আবরাহার বিশেষ হাতি—রাজকীয় হাতি। আমাকে সাধারণ কোনো কাজে ব্যবহার করা হতো না। মক্কার কা'বার প্রতি রুষ্ট হয়ে যে-উপাসনালয়টা সে নির্মাণ করছিলো, সে জন্যে পাথর কাঠ ইত্যাদি বোঝা বয়ে আনতে হতো দূরের পাহাড় থেকে। এ-কাজে ব্যবহৃত হতো একপাল হাতিই। কিন্তু একদিনের জন্যেও আমাকে ওদিকে 'ডাকা' হয় নি। ও-সব ছিলো ঐ সাধারণ হাতিদেরই কাজ। হঠাৎ করে উপাসনালয়-প্রসঙ্গটা টেনে আনলাম শুধু শুধু না, কারণ আছে। এ-উপাসনালয় নির্মাণের সাথে জড়িয়ে আছে আমার মূল কাহিনীর শিকড়। আরো খুলে বলি—

এ-উপাসনালয়টা তৈরী হচ্ছিলো বিশাল আকারে—কা'বা'র চেয়ে অনেক বড় করে। কিন্তু বদ নিয়তে। অর্থাৎ আবরাহার উদ্দেশ্য ছিলো বড়ো খারাপ। মক্কার কা'বার প্রতি মানুষের হৃদয়টান দেখে তার মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সুযোগ পেলেই মানুষ মক্কার কা'বা যিয়ারত করতে ছুটে যেতো। এখন কী করে মক্কাগামী মানুষকে সেই কা'বার মতো আরেকটা 'কা'বা' বানিয়ে এখানেই আটকে ফেলা যায়— এই হয়ে দাঁড়ালো আবরাহার সকাল-সন্ধ্যার চিন্তা।
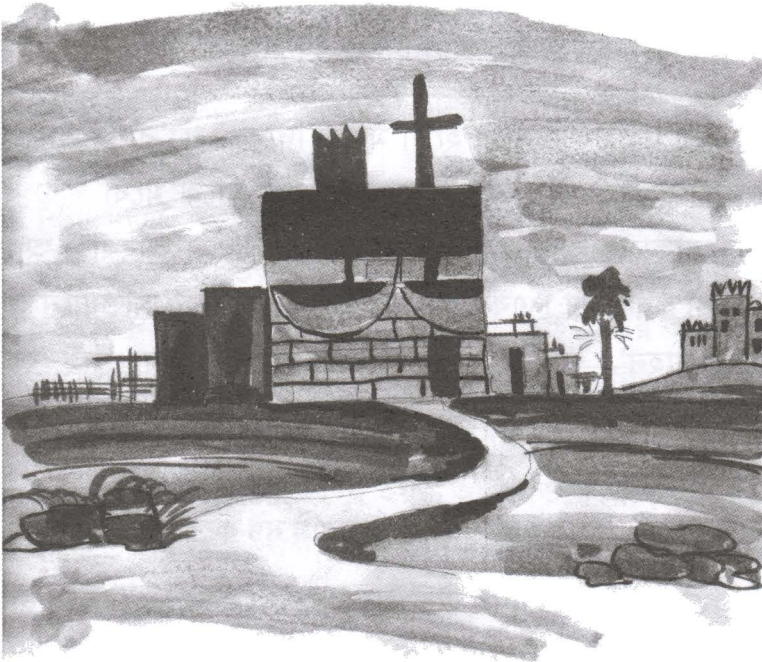
এক সময় যখন শেষ হলো এর নির্মাণ কাজ, দেখা গেলো ফল যা আশা করা হয়েছিলো, হয়েছে তার উল্টো। কেউ এলো না আবরাহার নকল কা'বায়। এই নকল কা'বার শোভা ও রূপময়তা দর্শনার্থী ও পথিকের দৃষ্টি কাড়লেও কারো হৃদয় কাড়তে পারলো না। সবাই আরো বেশী সংখ্যায় ছুটে যেতে লাগলো মক্কার কা'বায়। আসল কা'বায়। ইবরাহিমী কা'বায়। মানুষ তো আর এতোটা বোকা নয় যে আসল-নকলের পার্থক্যই বুঝবে না! কিন্তু আবরাহা মানুষের এই প্রত্যাখ্যানকে হজম করতে পারলো না। জালিমদের যা হয় আর কি! সময় থাকতে ওরা বোঝে না। আবরাহা ভীষণ চটে গেলো। রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে লাগলো। শেষটায় এ সিদ্ধান্তই নিয়ে বসলো— মক্কার কা'বা আমি ধ্বংস করে দেবো, নইলে এই বোকাগুলোকে ফেরানো যাবে না! আমার সাথে বেয়াদবি! দেখাবো এবার মজা আমি!

✺ ✺ ✺

বাস্, দেখতে দেখতেই শুরু হয়ে গেলো মক্কা অভিযানের জোর প্রস্তুতি। তৈরী হয়ে গেলো এক বিশাল হস্তিবাহিনী। বুঝতেই পারছো, আমি ছিলাম এই বাহিনীর সেরা আকর্ষণ। একদিকে আমি হস্তিবাহিনীর সেনাপতি। আরেকদিকে আবরাহার রাজ-বাহন।

হ্যাঁ প্রস্তুতি শেষ। এইমাত্র যাত্রা হলো মক্কার দিকে—কা'বা অভিমুখে। আমার পিঠেই চড়ে বসেছে সেনাপতি আবরাহা। আবরাহা মাঝে মধ্যে ঘাড় বাঁকা করে পেছনের দিকে তাকাচ্ছে আর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে। আবরাহা আমার কাছে দু'টি জিনিস আশা করছিলো। এক. তার এই কা'বা-বিধ্বংসী অভিযানে আমি যেনো হই তার 'মনের বাহন'—যা নির্দেশ দেবে তাই পালন করবো। দুই. আমি যেনো কা'বা-ধ্বংসে ব্যবহার করি আমার দানবীয় শক্তি—শুঁড়ীয় শক্তি। এ রকম আশা সে আমার কাছে করতেই পারে। কেননা অতীতে আবরাহার অসংখ্য 'অশুভ' ইচ্ছে আমি বাস্তবায়ন করেছি। তার ইচ্ছায় মুহূর্তেই আমি নষ্ট করে দিয়েছি অসংখ্য বস্তি।

✺ ✺ ✺

কিন্তু মক্কার কা'বা ভাঙার এই অভিযানে বের হতে আমার মন একেবারেই সায়

দিচ্ছিলো না। ভিতর থেকে আমি প্রচণ্ড একটা বাধা অনুভব করছিলাম। তবুও আবরাহার ইচ্ছায় আর আমার অনিচ্ছায় যেতে হচ্ছে মক্কায়। আমি পথ চলছিলাম নীরবে। কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম— কে কী বলে, শুনতে। তখন কানে ভেসে আসতে লাগলো বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কথা। কেউ কথা বলছিলো মক্কা নিয়ে, কেউ-বা কা'বা নিয়ে, কা'বা নির্মাণের ইতিকাহিনী নিয়ে। এ-সব কথা আমার মন-খারাপ অবস্থাকে আরো বাড়িয়ে দিলো। তবু কান পেতে আমি সব শুনছিলাম। ফলে অনেক অজানা ইতিহাসের কপাট আমার সামনে একে একে খুলে যেতে লাগলো।

মক্কায় এই কা'বা নির্মাণ করেছেন একজন নবী। তাঁর নাম ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)। আর এ-কাজে সহযোগী ছিলেন তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)। ছেলে বাবাকে পাহাড় থেকে পাথর এনে দিয়েছেন। এটা-ওটা এগিয়ে দিয়েছেন। ওরা আরো বলছিলো যে, নবী ইবরাহীমের অনেক মু'জিযা ছিলো। একবার তাঁর সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আগুনে ফেলে দিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র কী কুদরত! আগুন তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। আগুনের কাজ তো পুড়িয়ে দেয়া—জ্বালিয়ে দেয়া। কিন্তু সেদিন নাকি আগুন ইবরাহীমকে উল্টো দিয়েছিলো আরামদায়ক শীতলতা, স্বর্গীয় প্রশান্তি! এ-সব শুনে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো যে, ইবরাহীমের এই কা'বা আর আবরাহার ঐ গীর্জা এক নয়। কা'বা অনেক মহান। আল্লাহ্‌র নবীর হাতে গড়া এক শ্রেষ্ঠ গৃহ। প্রথম গৃহ। কা'বার আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেই মানুষ নিরাপদ, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি একটা কবুতরও যদি এখানে ওড়তে ওড়তে এসে বসে তাহলে কোনো শিকারী তাকে নিশানা বানাতে সাহস করে না। কেউ তার কাছেও যায় না। এ-স্থান চিরনিরাপদ ও শান্ত-সমাহিত এক স্থান। আসমানী নূর এখানে ঝরে ঝরে পড়ে। তা স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। আসমানী নূরে নূরময়। সবাই এ-স্থানকে ভালোবাসে। এখানে এসে জড়ো হয়। আবেগভরে পড়ে থাকে এখানে। কখনো চলতে থাকে তাওয়াফ— ঘন্টার পর ঘন্টা। কখনো ইবাদতে ইবাদতে কেটে যায় বেলার পর বেলা। কখনো চলে আত্মসমাহিত মানুষের অশ্রু-কাতর মুনাজাত। কখনো গুঞ্জরিত হয় আশপাশের গোটা পরিবেশ 'লাব্বাইক' ধ্বনির মধুর গুঞ্জরনে।

ঐশী গুঞ্জরনে। তাহলে আবরাহা কেনো এই মহান কা'বা ভেঙে ফেলার জন্যে অমন দুর্বিনীত? এতোটা মরিয়া, বেসামাল বেপরোয়া? আদৌ কি সে পারবে তার এ 'অপবিত্র' ইচ্ছে বাস্তবায়ন করতে? এ-সব ভাবতেই আমার ভিতরটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো। আমার চলার গতি শ্লথ হয়ে আসতে লাগলো।

সৈন্যদের আলোচনা থেকে আমি এ-ও জানতে পারি যে মক্কার মানুষ আমাকে ভালোই চেনে। ভীষণ ভয়ও পায়। তারা যখন জানতে পারলো যে আমাকে নিয়ে আবরাহা কা'বা গুঁড়িয়ে দিতে মক্কার দিকে ধেয়ে আসছে, তখন থেকেই নাকি তারা ভয়ে শঙ্কায় অস্থির হয়ে আছে। অজানা পরিণতির আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগে সময় পার করছে। সবার মনের উদ্বেগাকুল জিজ্ঞাসা— কী হবে? আমাদের কা'বা কি সত্যি ধ্বংস হয়ে যাবে?
আমার চলার পথে যা কিছু পড়ে স-ব আমি নষ্ট ও বরবাদ করে দিই— এ খবরও মক্কাবাসীর জানা ছিলো। তাদের আরো জানা ছিলো আমার দানবীয় শক্তির বেপরোয়া ব্যবহারের কথা। এক জালিম শাসকের আস্কারা-পাওয়া হাতির ধ্বংস-ছড়ানো জুলুমের কথা।

✺ ✺ ✺

আমরা মক্কার কাছাকাছি চলে এসেছি প্রায়। আর সামান্য পথ বাকি। এরপরই আবরাহার নির্দেশে কা'বা 'ধ্বংস হবে'। পৃথিবীতে কা'বা আর 'থাকবে না'। থাকবে শুধু আবরাহার ঐ নতুন 'কা'বা'টা (গির্জাটা)। হয়তো মক্কাও ধ্বংসলীলার শিকার হবে। ধুলোয় মিশে যাবে। আমি শুনেছি, প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো মক্কায় তেমন কোনো লোকবল ও সৈন্য বাহিনী নেই। এর মানে আবরাহার অশুভ ইচ্ছে বাস্তবায়নের পথে তেমন কোনো বাধা নেই। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। পথ প্রায় কণ্টকমুক্ত। আবরাহার হাতি হয়েও আমি এ জন্যে গভীর বেদনা অনুভব করছি। বেদনা-ঘেরা হৃদয়ে ভাবছিলাম— আবরাহার রোষ থেকে আজ না বাঁচতে পারবে মক্কা না তার কা'বা।

আবরাহার সৈন্য বাহিনীর ভিতরে লক্ষ্য করলাম একটা 'হামবড়া' (আমরাই সেরা) ভাব। কেউ কেউ আমার দিকে তাকিয়ে বলছিলো:

হে বীর! এগিয়ে যাও!
হে আবরাহার হাতি!
হে হাতির রাজা—সেরা হাতি!
সামনে বাড়ো!
ওদের এ-সব মন-ফুলানো কথা আমার একদম ভালো লাগছিলো না। আমার মন কেবলই বলছিলো— আবরাহার বাহিনীর কপালে আজ দুঃখ আছে। আমার কপালেও দুঃখ আছে। জালিমের হাতকে যারা শক্তিশালী করতে এসেছে, সবার কপালেই দুঃখ আছে। হায়! আমি যদি এখন পালিয়ে যেতে পারতাম!!

✵ ✵ ✵

মক্কা'র একদম কাছে এসে আবরাহা থামলো। শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিলো। এরপর সবাই আবরাহার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আক্রমণের নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলো। এর মধ্যেই আমি জানতে পারলাম যে, কিছুক্ষণ আগে মক্কার সরদার আবদুল মুত্তালিব আবরাহার খিমা ঘুরে গেছেন। তিনি তার 'উট' চাইতে এসেছিলেন। যাওয়ার সময় পরিস্কার ও অবিচলিত ভাষায় তিনি বলে গেছেন—

لِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيْهِ

'কা'বার একজন মালিক আছেন, তিনিই রক্ষা করবেন কা'বা!'

কিন্তু আবরাহা মক্কার সরদারের কথাকে আমলেই নিলো না। উল্টো মক্কা আক্রমণের নির্দেশ দিলো! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আবদুল মুত্তালিবের এই 'মহা ঘোষণা'য় আমার জান দ্বিতীয়বার কেঁপে উঠলো! অথচ আমি এক ভয়ঙ্কর হাতি। যা-ই সামনে পাই দুমড়ে-মুচড়ে যাই। শহর-নগর-পাড়া-মহল্লা— কিছুই আমার ধ্বংস-রোষ থেকে রক্ষা পায় না। মুহূর্তেই আমি যবরকে যের বানিয়ে দিই (সব উলট পালট করে দিই)। আমি না চাইলে কোথাও কোনো গাছপালা বা ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আমার 'সর্বসংহারক' (সবকিছু যা বিনাশ করে দেয়) শুঁড় থেকে কিছুই রক্ষা পায় না।
কিন্তু এ-মুহূর্তে আবরাহার নির্দেশে আমি সর্বসংহারকরূপে আবির্ভূত হতে— না

পাচ্ছি মানসিক বল, না পাচ্ছি শারীরিক বল। উল্টো আমি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলাম। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে দেহটা নিস্তেজ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, আর বুঝি চলতেই পারবো না। এ অবস্থা শুধু আমার একার না, সব হাতির। সব ঘোড়ার। সব উটের। সব সৈন্যের। কেউ ঠিকমতো চলতে পারছিলো না।

* * *

হঠাৎ দেখলাম আমি থেমেই পড়েছি, আর সামনে বাড়তে পারছি না। না, এক কদমও না। আমার দেহের সব যেনো অবশ হয়ে আসছে। পা'টাও নাড়াতে পারছি না। একটুও না। একেবারে ঠাঁয়-দাঁড়ানো অবস্থা। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছিলো, আমার পা যেনো কেউ পেরেক দিয়ে জমিনে পুঁতে রেখেছে। একই অবস্থা আমার সহসঙ্গীদেরও।

আবরাহা ভীষণ বিরক্ত হলো। বিরক্ত হলো সহসৈন্যরাও। রাজ্যের দুশ্চিন্তা অস্বস্তি ও অজানা আতঙ্ক ওদেরকে চেপে ধরলো। ওদের সব রাগ এসে পড়লো আমার উপর, আমি যেনো ইচ্ছে করেই অমন করছি! কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো; আমি ডানেও চলতে পারছিলাম এবং বামেও। কিন্তু কা'বা অভিমুখে? যেই সেই! এক কদমও চলতে পারছিলাম না। তবুও আবরাহার বিবেক জাগলো না। তবুও তার হুঁশ হলো না। কারো হুঁশ হলো না। আমাকে এবং আমার সহযোদ্ধাদেরকে চাবুকের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হলো। কিন্তু শত বেত্রাঘাতেও কাজ হলো না। আমি চলতে পারলাম না। কেউ চলতে পারলো না। অবশেষে আবরাহা লোহা গরম করে আমার গায়ে স্যাঁকা দিলো! তার প্রিয় হাতিটাই তার কাছে হয়ে উঠলো এখন ভীষণ অপ্রিয়। কিন্তু আগুনের এ 'দংশনে'ও কাজ হলো না। আমি চলতে পারলাম না, পারলামই না। তবুও অবুঝ আবরাহা বুঝলো না। তবুও জালিমের সুমতি হলো না! জালিমদের সুমতি হয়ও না। আমি এতোদিন তার সেবা করেছি, তার ইচ্ছায় উজাড় করে দিয়েছি কতো গাছপালা ও জনপদ, কিন্তু সে-সব 'উপকার'-এর কথা আজ ভুলে গেলো আমার অকৃতজ্ঞ মনিব। আমাকে চাবকালো। ঝলসানো স্যাঁকা দিলো। কিন্তু তাতেও-যে কিছু হলো না! আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই নিশ্চল থেমে রইলাম।

রইলাম। তখন মনে হচ্ছিলো আমিই পৃথিবীর সবচে' অসহায় প্রাণী। আমি আমার ভাষায় আবরাহাকে জানিয়ে দিলাম— মনিব! যতো চাও পেটাও, স্যাঁকা দাও, আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না, যেতে-যে পারবো না! আমি কা'বা ধ্বংস করবো না, করতে পারবো না। এ-কা'বা তোমার নকল 'কা'বা' নয়, এ-কা'বা ইবরাহীমের কা'বা! এ-কা'বা ইসমাঈলের কা'বা! এ-কা'বার রব তোমার চেয়ে অনে-ক শক্তিশালী! তোমার মতো অসংখ্য আবরাহাকে তিনি মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পারেন! হে জালিম! তোমার কপালে হয়তো সে পরিণতিই লেখা হয়ে গেছে!

কিন্তু আবরাহা আমার ভাষা বুঝলো না। মক্কা, কা'বা আর মক্কাবাসীর ধ্বংস ছাড়া যেনো তার পিপাসা মিটবে না। জালিমদের রক্ত-পিপাসা কখনো মিটে না। হায়! আমি যদি আবরাহার হাতি না হতাম! আমি যদি ওর 'জালে' আটকা না পড়তাম!
হে আমার প্রিয় বনভূমি!
কোথায় হারিয়ে গেছো তুমি?
হে অরণ্য-স্বাধীনতা!
হে সবুজ পৃথিবী!
আর কি ফিরে আসবে না?

✵ ✵ ✵

হঠাৎ হঠাৎ ঘটলো ব্যাপারটা! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না! দেখলাম আকাশ কালো করে এগিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদে পাখি! মুহূর্তে বিনামেঘেই আকাশটা আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। চারদিক যেনো সাঁঝ-সন্ধ্যায় ছেয়ে গেলো। ঠাহর করতে পারলাম না— আমি কি স্বপ্ন দেখছি না জেগেই আছি! এরপর যা ঘটলো এবং যতো দ্রুত ঘটতে লাগলো তা স্বপ্নকেও হার মানায়। কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়! সৈন্যরা চীৎকার করতে লাগলো— পাখি! পাখি!! পাথর! পাথর!!

দেখলাম একটা ছোট্ট পাথরকণা এসে পড়লো আমার কাছটায়! আকারে একেবারেই ছোট। এই একটা শস্যদানার মতো। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই ছোট্ট পাথরকণাটাই

আমার এক সহযোদ্ধার গায়ে এসে পড়লো তো সাথে সাথে ও চিৎপটাং। আরেকটা এসে ঐ ঘোড়াটার উপরে পড়লো তো ওটাও কুপোকাত। আরেকটা এসে উটের গায়ে পড়লো তো সেটাও একেবারে ভূতলশায়ী। এ-সব দেখে দেখে আমি কাঁপতে লাগলাম! জীবনে আমি কতো ধ্বংসলীলাই তো দেখেছি। নিজেও কতো ধ্বংস তাণ্ডব চালিয়েছি। কিন্তু ধ্বংসের অমন ভয়াবহতা আগে কখনো দেখি নি! দশাসই একটা সৈনিকের গায়ে ঐ পাখির ঠোঁট থেকে ছেড়ে-দেয়া ছোট্ট পাথরকণাটা যখন এসে পড়লো, সাথে সাথে ছটফট করতে করতে সে মারা গেলো! এভাবে আমার চোখের সামনে একে একে সব লুটিয়ে পড়তে লাগলো, যেনো কোনো বিষাক্ত তীর ওদের গায়ে এসে বিঁধছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি এত্তোটুকুন হয়ে গেলাম।

হঠাৎ চোখে পড়লো ঊর্দ্ধ গগন থেকে নেমে-আসা একটা আলোক রেখার উপর। তা দ্যুতি ছড়াচ্ছে কা'বার আশপাশে। আর আবদুল মুত্তালিবকে দেখলাম ভীষণ হাসিখুশি। বিজয়স্নাত মানুষের মাঝে অভিনন্দিত বীর যেমন হাসিখুশি থাকেন, ঠিক তেমনি! সবাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আবদুল মুত্তালিব আনন্দ গদগদ কণ্ঠে সবাইকে তখন একটা স্বপ্নের কথা বলছিলেন, যা তিনি দেখেছিলেন এই কয়েক রাত আগে। তিনি জানালেন যে, একটা রুপার শেকল যেনো তার পিঠ থেকে বেরিয়ে একটা মাথা তার উঠে গেছে আকাশের দিকে এবং আরেকটা মাথা ছড়িয়ে পড়েছে মাটির পৃথিবীতে। এরপর হঠাৎ মনে হলো এই শেকলটা একটা গাছে রূপ নিয়েছে। তার একটা পাতায় একটা আলোকচ্ছটা (আলোক-রশ্মি, আলোর টুকরো)। সবাই ঘিরে আছে সেই আলোকচ্ছটাকে।

এ-স্বপ্ন শুনে সবাই ভীষণ খুশি হলো। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বললো:

-আপনার বংশে জন্ম নেবেন এক মহা পুরুষ। দুনিয়া-জোড়া হবে তাঁর খ্যাতি। পূর্ব-পশ্চিমের অগণিত মানুষ তাঁকে মানবে। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করবে।

সবাই আবদুল মুত্তালিবকে নতুন করে অভিনন্দন জানালো। মুবারকবাদ দিলো। শেষে জানতে চাইলো:

-মান্যবর সরদার! কী নাম রাখবেন তাঁর?

তিনি বললেন:

-আমি তার নাম রাখবো মুহাম্মদ! যাতে সবাই তার প্রশংসা করে, স্তুতি গায়! এই জমিনে যারা আছে তারাও এবং ঐ আকাশে যারা আছে তারাও!

❋ ❋ ❋

প্রিয় বন্ধু! মুহাম্মদ-এর আগমনের এ-সুসংবাদের সাথে সাথেই আমি —আবরাহার হাতি— বিদায় নিচ্ছি। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ত্রাস ছড়ানো এক বিশাল হাতির জীবন। তবে শেষ বেলায় তোমাদেরকে জানিয়ে যেতে চাই— আবরাহাদের দিন শেষ। এখন বেঁচে থাকবে শুধু কা'বা! ততোদিন, যতোদিন বেঁচে থাকবে এই আকাশ, এই পৃথিবী! কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের সময় তাঁর উম্মত! হ্যাঁ, এ সবই ইতিহাসের বুকে লুকিয়ে থাকা কথা! জানিয়ে দিলাম তোমাদেরকে! তাতে যদি একটু ঘোচে আমার আবরাহার হাতি হওয়ার কালো দাগ!

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ . تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ . ﴾

'তুমি কি দেখো নি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীকে কেমন করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন? তিনি কি তাদের (কা'বা ধ্বংসের) চক্রান্ত ভণ্ডুল (ব্যর্থ বা অকৃতকার্য) করে দেন নি? আর তাদের বিরুদ্ধে পাঠান নি কি ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদে পাখি? যারা তাদের উপরে ছোট ছোট পাথরকণা ছুঁড়ে মারছিলো! অতঃপর তাদেরকে পশু-চাবানো ঘাষের মতো ভর্তা বানিয়ে দিয়েছিলো!' -সূরা ফিল

আমি মা হালিমার সেই বাহন
শীর্ণকায় গাধী

হালিমা সা'দিয়ার নাম শুনেছো? আমি তার কাছেই থাকি। অনেক দিন থেকেই। তিনি একজন আদর্শ দাঈ-মা। মায়েরা নিজেদের আদুরে দুলালদের (দুধ-শিশুদের) তার কাছে পাঠিয়ে দেন, আর তিনি তাদেরকে দুধপান করিয়ে করিয়ে গড়ে তোলেন মাতৃ মমতায়। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন তো আর কৌটাজাত গুঁড়ো দুধ ছিলো না। তাই আরবের শহুরে মায়েরা পল্লীগ্রামের দাঈ-মা'দের কাছে দুধ-শিশুদের পাঠিয়ে দিতেন। অবশ্য পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ ভাষা ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় শিশুদের বেড়ে ওঠার বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

হালিমা'র ধন ছিলো না, তবে ধনী একটা মন ছিলো। স্বামী হারিসকে নিয়ে থাকেন তিনি তায়েফ নগরী থেকে আশি কিলোমিটার দূরে শোহাতা পাহাড়ি উপত্যকায়, তাঁবু-সদৃশ ছোট্ট একটা 'কুটিরে' (গৃহে)। ঐ এলাকাটা ছিলো অনুর্বর, বৃষ্টি-বাদলা হয় না বললেই চলে। আর সবুজে আঁকা বন-বনানী এবং তার রূপ-রুপালী, মরুর দেশে সে তো কল্পনার ছবি! সুতরাং ওখানে চাষবাসে মোটেই সুবিধা করা যেতো না। এ দিকে আমিও দুবলা (শীর্ণ ও দুর্বল) পাতলা। নিজের দেহটাকে টেনে বেড়ানোই ছিলো এক কাজ। তবুও আমি তাদের সঙ্গেই ছিলাম, সঙ্গেই আছি। তাদের যে-কোনো উপকারে দেহ-মন উজাড় করে দিই। তারা খুব ভালো মানুষ। অমন ভালো মানুষের উপকারে পিছিয়ে থাকবো— তেমন অকৃতজ্ঞ আমি নই।

✵ ✵ ✵

একদিন আমি তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হালিমা ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। দাঁড়ালেন এসে একেবারে আমার কাছটি ঘেঁষে। হালিমা আমার পাশে অমন করে দাঁড়ালে আমার খুব ভালো লাগে। আজ কি তিনি দূরে কোথাও যাবেন? নাকি আমাকে নিয়ে চারণভূমিতে যাবেন? চারণভূমিতে গেলেই ভালো। ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, দেখি কী হয়—কোথায় যান। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হালিমা কী যেনো ভাবলেন। তারপর আমার লাগামটা হাতে নিলেন। তারপর আমার উপর চেপে বসলেন।

না, যা ভাবছিলাম তাই হলো। যা চাইছিলাম তা হলো না। মানে একটা দূরের সফরের জন্যে তিনি বের হচ্ছেন। তবু আমার মন খারাপ হলো না। হালিমার উপর কখনো আমার মন খারাপ হয় না। সাথে আছে তার ছিঁচকাঁদুনে শিশুটাও। ছিঁচকাঁদুনে বলার কারণ আছে। কান্না শুরু করলে ও আর থামতে চাইতো না। কী করবে বেচারা! দুধের শিশু দুধ না পেলে তো কাঁদবেই! আর বৃষ্টিহীন ফসলহীন সা'দপল্লীতে মা হালিমা'র বুকে দুধ আসবে কোত্থেকে? বাচ্চাটার কান্না আমাকে খুব কষ্ট দেয়। তখন আমি নিজের খিদের কথা ভুলে যাই। আমি তো অনেক বড়, খিদের জ্বালা সইতে পারি। কিন্তু ও তো ছোট—দুধশিশু, কেমন করে সইবে ক্ষুধার কষ্ট? আমাদের সঙ্গে আছেন হালিমার স্বামী— হারিসও। আরো যোগ দিয়েছে বনু সা'দ এর বেশ ক'জন মহিলা। হারিস চেপে বসেছেন তার অতি বয়স্ক উটনীটিতে। আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। মরুভূমির পথ কেটে কেটে ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে লাগলাম।

✷ ✷ ✷

সেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিলো। ক্ষুধায়-গরমে আমার অবস্থা কাহিল। অনেক কষ্টে পা ফেলে ফেলে চলছিলাম। মনে হচ্ছিলো, আমার চেয়ে আমার পায়ের ওজনই বেশী। আসলেই আমি ছিলাম সীমাহীন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত—সফরের অনুপযোগী। এদিকে ওই শিশুটা অবিরাম কেঁদেই চলেছে। আমার ক্লান্তির ওইটাও একটা কারণ। কেননা আমি শিশুদের কষ্টের কান্না—ক্ষুধার কান্না সইতে পারি না। মা হালিমা ওকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোথায় দুধ! বুক শুকিয়ে কাঠ! এক কাতরা

দুধও বাচ্চাটার মিললো না। আমার বড়ো মায়া হলো। ইস্! নিষ্পাপ শিশুটা একটু দুধের জন্যে কী কষ্ট করছে! মা হালিমার চোখ ছলছল করে ওঠে চিরন্তন মাতৃমমতায়। আমার চোখও ভিজে ওঠে শিশু-মমতায়! হারিস একটু উষ্মা মেশানো কণ্ঠে বললেন:

-নিজের শিশুকেই তুমি দুধ পান করাতে পারছো না, কেনো তবে আরেক শিশুকে আনতে যাওয়া?!

হালিমা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন:

-আরেকটা শিশু এলে আমরা তার পরিবারের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু পারিশ্রমিক পাবোই। তাই দিয়ে আমাদের দিন বেশ চলে যাবে। দুঃখের দিন কিছুটা হলেও ঘুচবে। আমার বুকেও দুধ আসবে। তখন এ-ও খাবে, ও-ও খাবে। আমরা চেষ্টা করবো কোনো ধনীর দুলালকে নিয়ে আসতে। তাহলে আমাদের পারিশ্রমিকটা একটু বেশী হবে।

হারিস আর কথা বললেন না।

আমি নীরবে শুনলাম তাদের কথা, যেনো ছোট ছোট দুঃখকণা! আবার আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠলো! অবশ্য অজানা একটা আনন্দও আমার মনে দোল দিয়ে গেলো! যদিও আমি বুঝতে পারছিলাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি।

আমি হারিসের উটনীটির কাছে জানতে চাইলাম:

-এই! আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ওর আবার মরু-পথঘাট সব জানা। বয়স তো আর কম হয় নি, আমার চেয়ে ঢের বেশী। কতো জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ওকে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তাই চট করে জবাব দিলো:

-আমরা মক্কায় যাচ্ছি!

মক্কার কথা শুনে আমার মনটা আনন্দে দুলে উঠলো। মক্কা-যে আমার ভীষণ প্রিয়! খুশিতে আমি হেলে-দোলে পথ চলতে লাগলাম। আমি দ্রুত পথ চলার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। কীভাবে পারবো, শরীরটায়-যে কিছু নেই, একেবারেই দুবলা-পাতলা, পথ চলছিলাম সবার পেছনে পেছনে।

আমরা এক সময় মক্কায় পৌঁছে গেলাম। হালিমা বেরিয়ে গেলেন শিশুর খোঁজে। ছুটোছুটি করতে লাগলেন এখানে ওখানে। অনেকক্ষণ পর ফিরে এলেন হালিমা। কিন্তু মুখে তার হতাশার ছায়া। যেনো মুখজুড়ে লেপটে আছে পোঁচ-পোঁচ দুঃখ ছাপ। স্বামীর পাশে বসতে বসতে তিনি বললেন:

-মনে হচ্ছে শূন্য হাতেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, যেমন এসেছিলাম তেমন। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে আরো ক্ষুধা, আরো কষ্ট, আরো ক্লান্তি! আমি ছাড়া আর সবাই বাচ্চা পেয়ে গেছে। এদিকে আর বাচ্চাও নেই— একটি এতিম ছাড়া!
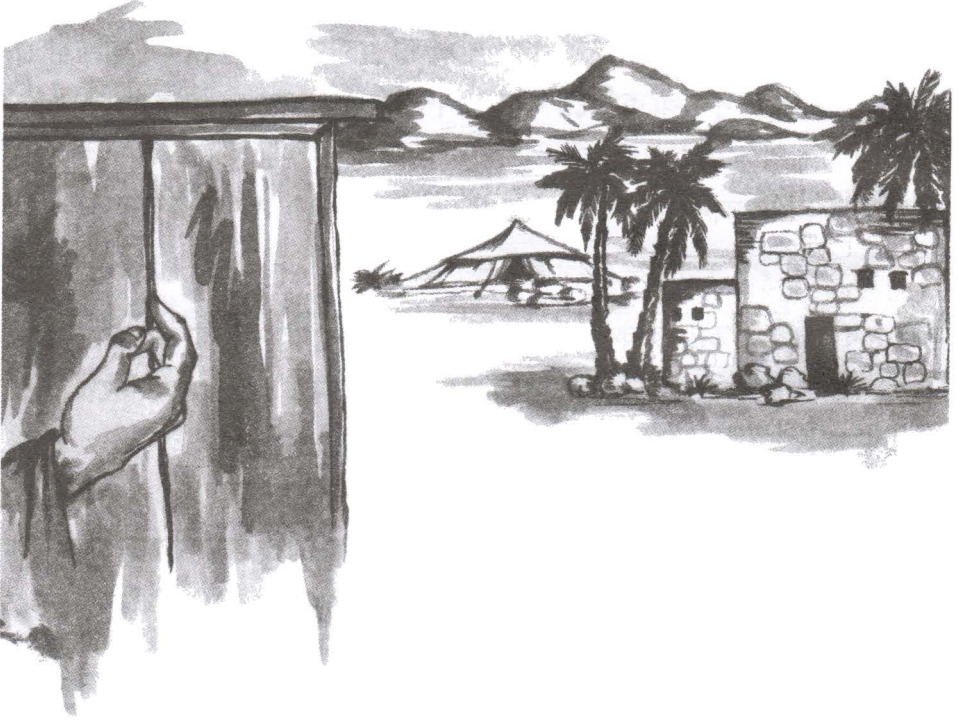
তার কথা শুনে আমার মনটা বিষাদে ভরে গেলো। হায় বেচারি, কতো আশা নিয়ে এসেছিলেন! এখন কী হতাশাই না তাকে ঘিরে ধরেছে! কেউ তাকে বাচ্চা দিতে চাইছে না। হয়তো কেউ-ই তাকে পছন্দ করছে না। তার দারিদ্র দেখে, তার স্বাস্থ্যহীনতা দেখে। কিন্তু তার মনটা-যে আকাশের মতো উদার, তার কোলে

যে কোনো দুধশিশুই-যে গভীর মমতায় জড়িয়ে থাকে— সে খবর কেউ জানলো না! যদি জানতো! কিন্তু ওই এতিম বাচ্চাটাকেই কেনো নিয়ে নিচ্ছেন না তিনি?! আমার মন কেনো যেনো নিজের অজান্তেই ওই না-দেখা এতিম বাচ্চাটার ভালোবাসায় দুলে উঠলো!

✺ ✺ ✺

একটু বিশ্রাম নিয়ে হালিমা আবার বেরুলেন বাচ্চার সন্ধানে। অনেকক্ষণ পর তিনি ফিরে এলেন, তাঁর কোলে একটা বাচ্চা—ফুটফুটে একটা দুধশিশু। ভীষণ পুলকিত মনে হচ্ছিলো হালিমাকে। দূর থেকেই স্বামীকে লক্ষ্য করে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন তিনি:

-আল-হামদুলিল্লাহ!

আমরাও তার পুলকে জেগে উঠলাম— বাচ্চা তাহলে পাওয়া গেছে! আমার মনে হলো; এ-ই সেই এতিম—আমার অজানা ভালোবাসা!! কাছে আসতেই আমি একটা ঘ্রাণ পেলাম, ভীষণ মিষ্টি ঘ্রাণ। অন্য রকম মিষ্টি ঘ্রাণ। যেনো মেশক আম্বরের ঘ্রাণ। আর এ-যে বয়ে নিয়ে-আসা এ-বাচ্চারই ঘ্রাণ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। কী সুন্দর ফুটফুটে চেহারা! হালিমার কোলে যেনো পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসেছে! মিটিমিটি হাসছে! মায়াবি আলো ছড়াচ্ছে! হারিস কাছে গেলেন। আরো কাছে। গভীর দৃষ্টিতে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়েই রইলেন। যেনো কতো কালের চেনা কোনো প্রিয় মুখ অনেক কাল পর তিনি দেখছেন! হারিসের চোখে মুখে আনন্দোচ্ছ্বাস ঝলমল করতে লাগলো। তিনি আনন্দ-প্লাবিত কণ্ঠে বললেন:

-কার মাণিক নিয়ে এসেছো তুমি হালিমা!

-এর নাম মুহাম্মদ! মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। ওর দাদা কোরাইশ সরদার। ও এতিম—বাবা বেঁচে নেই, ওর জন্মের ছয় মাস আগেই চলে গেছেন। মা—আমেনা বিনতে ওয়াহব, কোরাইশ গোত্রের বিদূষী মহিয়সী নারী।

সব শুনে হারিসের আনন্দের কোনো সীমা রইলো না। তিনি খুশিতে গদগদ হয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সা'দপল্লীতে ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিলেন।

আশ্চর্য! হালিমার ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চাটি এখন আর কাঁদছে না! বরং ও ছিলো বিস্ময়করভাবে হাসিখুশি! কারণ কি শুধু এই যে ও এইমাত্র অনেক দিন পর তৃপ্তিভরে মায়ের দুধ পান করেছে! যা একটু আগেও ছিলো অকল্পনীয়! কিন্তু যেই মুহাম্মদ এলো অমনি হালিমার দুধহীন শূন্য বুকেও মাতৃদুধের যেনো বান ডেকে গেলো! আল্লাহ্‌র কী মহিমা! সেই দুধ পান করে শিশুটি এখন তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত! তাহলে এখন কেনো ও আর কাঁদবে?! আমার মনে প্রশ্ন জাগে— মুহাম্মদের মতো দুধভাই প্রাপ্তি, সেও কি কান্না বন্ধ হয়ে যাওয়ার আরেকটা কারণ?!

এবার ফিরে যাওয়ার পালা। আবার হালিমা আমার উপর বসলেন। এখন তার সাথে একজন নয়, দু'জন শিশু—নিজের সন্তান আর শিশু মুহাম্মদ। হারিস চড়ে বসলেন নিজের বাহনে—বৃদ্ধ উটনীটিতে। শুরু হলো ফিরতি সফর। আমি আবিস্কার করলাম, এবার আমার চলার গতি দ্রুত, বিস্ময়কর দ্রুত! আমাদের সঙ্গে যারা মক্কা থেকে বেরিয়েছিলো তাদেরকে পেছনে ফেলে এবং যারা আমাদেরকে পেছনে ফেলে আগে চলে গিয়েছিলো তাদেরকেও পেছনে ফেলে আমি আগে চলে গেলাম! আগে মক্কার কথা শুনে 'কল্পনায়' আগে আগে চলছিলাম, এখন বাস্তবেই আগে আগে চলছি! এমন তো হবেই! কেননা আমি প্রচুর শক্তি অনুভব করছিলাম। ভীষণ তৃপ্তি অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিলো, যেনো আমি সারাদিন চারণভূমিতে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেয়ে এই মাত্র ফিরেছি, হৃষ্টপুষ্ট হয়ে।

এদিকে হারিসের বৃদ্ধ উটনীটিকে চেনাই যাচ্ছিলো না। বাব্বা, সে কী গতি! আমাকে পেছনে ফেলে ছুটে চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে, যেনো একটা তেজি ঘোড়া!

হ্যাঁ সবাইকে পেছনে ফেলে আমরা সময়ের বেশ আগেই পৌঁছে গেলাম সা'দপল্লীর তাঁবুতে—হালিমা ও হারিসের তাঁবুতে। তাঁবুতে পৌঁছে দেখি—
বরকতের অমিয়ধারায় সব 'সয়লাব'!
বিরান সা'দপল্লী এখন উর্বরা!
পাতাঝরা শূন্য গাছে এখন সবুজ সবুজ কিশলয়!
আর ঊষর প্রকৃতি যেনো গায়ে চড়িয়েছে সবুজের চাদর!

ঘাসহীন চারণভূমিতে লকলক করছে সবুজ ঘাসেরা!
বদলে গেছে আকাশ!
বদলে গেছে বাতাস!
বদলে গেছে মানুষ!
বদলে গেছে তাঁবু!
বদলে গেছে আশ্‌পাশের সবকিছু!
কী মজা! মুহাম্মদ আসার পর সব বদলে গেছে!
সব বদলে গেছে!

হে মুহাম্মদ!
তুমি এতিম নও শুধু, তুমি মানিক, পরশ পাথর!
তুমি সবকিছু বদলে-দেওয়া মানিক!
স্বাগতম তোমাকে হে মুহাম্মদ সা'দপল্লীতে!

কয়েকদিনেই আমরা—মেষ-দুম্বা-উটনী-গাধা— বেশ মোটাতাজা হয়ে গেলাম। আর হালিমা! তার আনন্দের কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এর আগে নিজের বাচ্চাটাকেই তিনি দুধ পান করাতে পারতেন না। আর এখন তার দুধ এতো বেড়ে গেছে যে, নিজের বাচ্চার জন্যে যথেষ্ট হয়ে শিশু মুহাম্মদের জন্যেও যথেষ্ট হয়ে আরো অনেক অনেক থেকে যায়। আল্লাহ্‌র কী মহিমা! হারিসও ছিলেন সীমাহীন আনন্দিত। তাঁর চোখে মুখে সব সময় লেগে থাকতো আনন্দ ও তৃপ্তির আভা, যা আগে আমি কখনো দেখি নি!

আমি ছিলাম মা হালিমার প্রিয় বাহন। তিনি কোথাও গেলে আমাকেই নিয়ে যেতেন। মুহাম্মদ আসার পর তাঁকেও সঙ্গে নিতে তিনি ভুলতেন না। শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে তিনি মনের হরষে আমার পিঠে চড়ে বসতেন, এখানে ওখানে যেতেন। নিজের মেষপাল তদারক করতেন। মুহাম্মদকে নিয়ে যখন হালিমা আমার পিঠে বসতেন তখন আমার কী-যে ভালো লাগতো, সে কথা বলে বোঝাতে পারবো না। ভর দুপুরের তপ্ত মরুতেও তাদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে আমার একদম খারাপ লাগতো না—কোনো কষ্ট হতো না। বরং অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম, দূর আকাশের বুকে একটা মেঘখণ্ড যেনো সূর্যিমামার প্রচণ্ড দাহ থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে—ছায়া দিচ্ছে! জীবনে কতোজনকে নিয়ে মরুর বুকে আমি কতো ঘুরে বেড়িয়েছি,

কিন্তু এমন মজা তো আর পাই নি!

এই আশ্চর্য প্রশান্তি তো কখনো অনুভব করি নি!

ভর দুপুরে অমন বাদল-ছায়ার আয়োজন তো আর চোখে পড়ে নি!

মনে আমার কতোবার প্রশ্ন জেগেছে—

কে এই এতিম?

কে তুমি হে মুহাম্মদ?

কেনো তোমার এতো শান?

কেনো তোমার এতো মান—

প্রকৃতির কাছে .. মেঘের কাছে?

ভবিষ্যতের কোন্‌ মহাপুরুষ লুকিয়ে আছে তোমার ভিতর?

এভাবেই সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর তারপর বছর ঘুরে এসে গেলো আরেক বছর। তারপর আরেক বছর। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখন দু' বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পা রেখেছে। ইতিমধ্যেই ওর দুধ ছাড়ানো হয়েছে। এ-বয়সের শিশু আর কতোটুকুন বড়ই-বা হয়! কিন্তু মুহাম্মদ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দু'বছর না পেরুতেই বয়সের তুলনায় ও অনেক বেশী স্বাস্থ্যবান ও বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে। এদিকে দু'বছর পর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা কথা ছিলো। কিন্তু মা হালিমা মনে-প্রাণে চাইছিলেন মুহাম্মদ তার কাছে আরো অনেক দিন থাক। অমন বরকত-শিশুকে কে হাতছাড়া করতে চায়? কে হারাতে চায় অমন চাঁদমুখ? তার স্নিগ্ধ ছায়া থেকে কে বঞ্চিত হতে চায়? সত্যি কথা বলতে কি, আমিও চাইছিলাম

মুহাম্মদ আরো অনেক দিন থাকবে আমাদের মাঝে। তাকে দেখে দেখে চোখ জুড়াবো আর বয়ে বয়ে ঘুরে বেড়াবো—মন ভরবো। এখানে ওখানে, যেখানে মনে চায় সেখানে। 'সবুজ ঘাসের সজীব' দুনিয়ায়। তাঁর বরকতের বৃষ্টিতে পরিস্নাত সা'দ পল্লীর মুক্ত আঙ্গিনায়। ক্লান্তিহীন—শ্রান্তিহীন।

অমন সোনার ছেলেকে পিঠে নিতে কার-না সাধ হয়?

অমন বরকতি শিশুর স্পর্শে কে-না শিহরিত হয়?

কিন্তু আমরা চাইলেই তো হবে না! ওদিকে মা আমেনাকেও-যে চাইতে হবে! দু'চাওয়া এক হলেই কেবল আমরা পাবো মুহাম্মদকে, আরো অনেক দিন, অন্তত কিছুদিন। কিন্তু এখন তো তাঁকে এখানে—সা'দপল্লীতে রাখার আর সুযোগ নেই! নিয়ে যেতে হবে, হবেই, মক্কায়। ফিরিয়ে দিতে হবে। তখন মা আমেনার মন গললে, দু'চাওয়া এক হলে আবার আসবে মুহাম্মদ সা'দপল্লীতে। নইলে এ-ই শেষ বিদায়! অশ্রু-ছলোছলো বিদায়!!

কিন্তু এটা মানতে আমার মন কোনভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে না! (কী অবুঝ মন আমার!)

❋ ❋ ❋

একদিন হালিমা মুহাম্মদকে নিয়ে আমার পিঠে চেপে বসলেন। রওয়ানা হলেন মক্কায়, মা আমেনার কাছে। সারাটা পথই তিনি ছিলেন বিমর্ষ। নীরব আচ্ছন্নতায় মলিন। এ-যে মুহাম্মদের আসন্ন বিরহ-কাতরতার দুঃখ-দুঃখ ছাপ—তা বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হলো না। নিজের অজান্তেই আমার চোখের পাতা ভিজে গেলো।

মা আমেনা কি রাখবেন আমাদের আবেদন?

'না' বলে দিলে শূন্য হাতে কেমনে ফিরবো আমরা?

আমি কেমনে তাকাবো মা হালিমার ভেজা চোখের দিকে?

কেমন করে সইবো মুহাম্মদের মহা বিরহ?

আমরা মক্কায় পৌঁছে গেলাম। ঐ তো দেখা যাচ্ছে মা আমেনার ছোট্ট ঘরটা। হালিমা মুহাম্মদকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে, মা আমেনার ঘরের পাশটি ঘেঁষে, উৎকর্ণ হয়ে।

একটু পরই শুনতে পেলাম হালিমার কণ্ঠ, ব্যাকুল কণ্ঠ!
হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া উদ্বেল কণ্ঠ!
তিনি আমেনার কাছে আবদার করেছেন,
মুহাম্মদ-স্নেহে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে,
মুহাম্মদকে আরো কয়েকটা দিনের জন্যে তার সঙ্গে সা'দপল্লীতে পাঠাতে!

এ-আবদারের সামনে মা আমেনা নরম হয়ে গেলেন! তার মনটা-যে নরম! তিনি 'না' বলতে পারলেন না! এমন-যে হবে তা আগেই আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছিলো! কিন্তু এতো সহজেই-যে হবে তা ভাবতে পারি নি! আবারো আমার চোখের পাতা ভিজে গেলো! একটু আগে আমি কেঁদেছিলাম মুহাম্মদের বিরহ-আশঙ্কায়, মা হালিমার বিমর্ষতায়। এখন কাঁদছি এক ধাত্রীর কাছে এক মহিয়সী নারীর নিজের ছেলেকে সঁপে দেওয়ার অপার মহানুভবতায়!!

✵ ✵ ✵

মক্কা ছেড়ে আমরা তায়েফের পথ ধরলাম। হালিমার বিমর্ষতা এখন রূপ নিয়েছে হর্ষোচ্ছ্বাসে! আর আমি তো আনন্দের আতিশয্যে যেনো উড়ে উড়েই ছুটছিলাম! যে-ই আমাকে দেখছে বিশ্বাস করতে পারছে না আমি হালিমার সেই দুবলা-পাতলা গাধাটি! হারিসের সাথে দেখা হতেই তিনিও তাকালেন অবিশ্বাস্য চোখে! যেনো হারানো মানিক ফিরে এসেছে কোলে! আমার কাছে মনে হলো সমগ্র সা'দপল্লীই যেনো আবার মেতে উঠেছে আনন্দ-কলরবে—
কী আনন্দ .. কী মজা!
আবার এসেছে আমাদের প্রিয় মুহাম্মদ!
হ্যাঁ, আবার নামলো আমাদের আকাশে বরকতের বৃষ্টি!
এ বৃষ্টিতে স্নাত হচ্ছি আমরা,
আমাদের প্রকৃতি!
ঠিক আগের মতোই!
বরং আরো বেশী করে!
আরো মুষলধারে!

সবাই আমাদেরকে ঈর্ষা করতে লাগলো!
আমাদের আকাশের নীচে স্নাত হতে চাইলো!
সবাই অবাক বিস্ময়ে আমাদের উপর মুহাম্মদী বৃষ্টির বর্ষণ দেখতে লাগলো! আমাদের মেষপাল যেখানে, সেখানে এসে ভীড় জমায় অন্যদের মেষপাল— বরকত লাভের আশায়, স্নাত হওয়ার বাসনায়!
কিন্তু কী আশ্চর্য! আল্লাহর কী লীলা!!
আমরা ভিজি বৃষ্টিতে 'না চাইতেই' আর ওরা ভিজতে পারে না— শত চেয়েও!
অথচ একই আকাশ, একই বাতাস!
একই মাটি, একই প্রকৃতি!
রহস্য কী?
আল্লাহই ভালো জানেন!
তবে আমার মনে হয়; আমাদের আছে মুহাম্মদ ওদের নেই মুহাম্মদ— এটাই রহস্য!!

* * *

একদিন হালিমার ছেলেটা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, সারা মুখে লেগে আছে উৎকণ্ঠার ছাপ! এসেই চীৎকার করে বলতে লাগলো:
-মা! মা! জানো কী হয়েছে! হঠাৎ ধবধবে সাদা পোশাকের দু'টি লোক আমাদের কোরাইশী ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে পাহাড়ের আড়ালে!
হারিস উৎকণ্ঠাভরে বললেন :
-কী! কী বলছো তুমি? ধরে নিয়ে গেছে মানে! ও তো আমাদের কাছে আমানত! ওর নিরাপত্তার সকল দায়-দায়িত্ব তো আমাদের!
হালিমার ছেলেটা বলে চললো:
-তারপর আমি দেখলাম, একজন ভাইয়াকে শুইয়ে দিয়ে বুক ফেঁড়ে ফেলেছে! আরেকজন বুকের ভিতরে কী যেনো খুঁজে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো!
-তারপর?!
-তারপর চলে গেলো! একটু পরই দূরে মিলিয়ে গেলো!

হালিমা ও হারিস ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলেন অকুস্থলে। আমি নিজেও গিয়ে হাজির হলাম

সেখানে। গিয়ে দেখি—কই, তেমন কিছু চোখে পড়ছে না তো! মুহাম্মদ সুশান্ত ভঙিতে দাঁড়িয়ে আছে! এক টুকরো মিষ্টি হাসি লেগে আছে ওর নূরানি চেহারাজুড়ে। না, ওর কোনো সমস্যা হয় নি। সব ঠিক আছে। কিন্তু সব ঠিক থাকলেও মুহাম্মদের মুখে সব শোনার পর হারিস বেশ ঘাবড়ে গেলেন। হালিমাকে জানালেন তার ভয়ের কথা আশঙ্কার কথা এবং সিদ্ধান্ত নিলেন দ্রুতই মুহাম্মদকে মক্কায় মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন।

✺ ✺ ✺

মুহাম্মদ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু যে-বরকত তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তা আমাদেরকে ছেড়ে গেলো না। আমাদের জন্যে রেখে গেছেন তিনি বৃষ্টি। রেখে গেছেন সবুজে ছাওয়া দৃষ্টিকাড়া প্রকৃতি। খুলে দিয়ে গেছেন জীবন-জীবিকার অবারিত দিগন্ত। আমাদেরকে তিনি আরো দিয়ে গেছেন সুখ-শান্তি-সৌভাগ্য, যা দিনে দিনে আরো অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীতে অবশ্য আমরা জানতে পারি যে, ঐ লোক দু'জন আসলে ছিলেন আসমানী ফেরেশতা। এসেছিলেন মুহাম্মদের হৃদয়টাকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে যেতে। আগামী দিনের মহা গুরুভার বহনে তাঁকে প্রস্তুত করে তুলতে। এ-সব জানার পর আমার সৌভাগ্যের অনুভূতি আমার ভিতরে কলরব করে উঠলো—

আহা! এমন মুহাম্মদকেই আমরা পেয়েছিলাম এতো কাছে, এতো আপন করে! তাঁকে পিঠে নিয়ে আমি ঘুরতে পেরেছি, সা'দপল্লীর বাঁকে বাঁকে, পাহাড়ের উপত্যকায় উপত্যকায়! ধন্য আমার বাহন-জীবন!!

আমি কালো পাথর বলছি

আমি পাথর। কিন্তু অন্যসব পাথরের মতো নই। যে-সব পাথর দিয়ে তোমরা ঘর বানাও, মাদ্‌রাসা নির্মাণ করো কিংবা কারখানা তৈরী করো, তেমন পাথর নই আমি। আমি অনেক দামী পাথর। পৃথিবীতে যতো দামী পাথর আছে বা থাকতে পারে, তার চেয়েও আমি দামী। হীরে-মোতি-পান্না'র চেয়েও অনে-ক দামী। পাথর হলেও আমি আমিই। জুড়িহীন। সঙ্গিহীন। তুলনাহীন, আমার কোনো তুলনা নেই। আমার তুলনা শুধুই আমি।

আমার ইতিহাস জানতে চাও? আমি যেমন পুরোনো তেমনি মহিমান্বিত। আমি যেখানে অবস্থান করছি, তাও চির মহিমান্বিত। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম ঘর—কা'বা-এর একটা কোণে আমাকে স্থাপন করা হয়েছে, যা নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম এবং তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল। এবার চিনতে পেরেছো আমায়? হ্যাঁ, আমি হাজরে আসওয়াদ—কালো পাথর! আরেকটা বড় পরিচয় বলে দিচ্ছি তোমার কানে কানে, আমি জান্নাত থেকে এসেছি!

এবার আমার গল্প শোনো—

একবার আকস্মিক বন্যায় কা'বাঘর ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। নতুন করে তা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলো। আর মক্কাবাসীরা সে সংস্কার-কর্ম সম্পাদনও করলো, সব গোত্র মিলে। কিন্তু শেষে তারা আমাকে আমার নির্দ্ধারিত জায়গায় স্থাপন করতে যেয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়লো। এ-মতবিরোধ গড়াতে গড়াতে একেবারে 'যুদ্ধ-উত্তেজনায়' রূপ নিলো। এক গোত্র বললোঃ

-এ কাজ আমরা করবো!

আরেক গোত্রের দাবি:

-না, এ-কাজ আমাদের, আমরা করবো!

আরেক গোত্রের হুঙ্কার:

-অসম্ভব! এ-কাজ শুধু আমাদের, আমরাই করবো! কেউ বাধা দিতে এলে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো না!
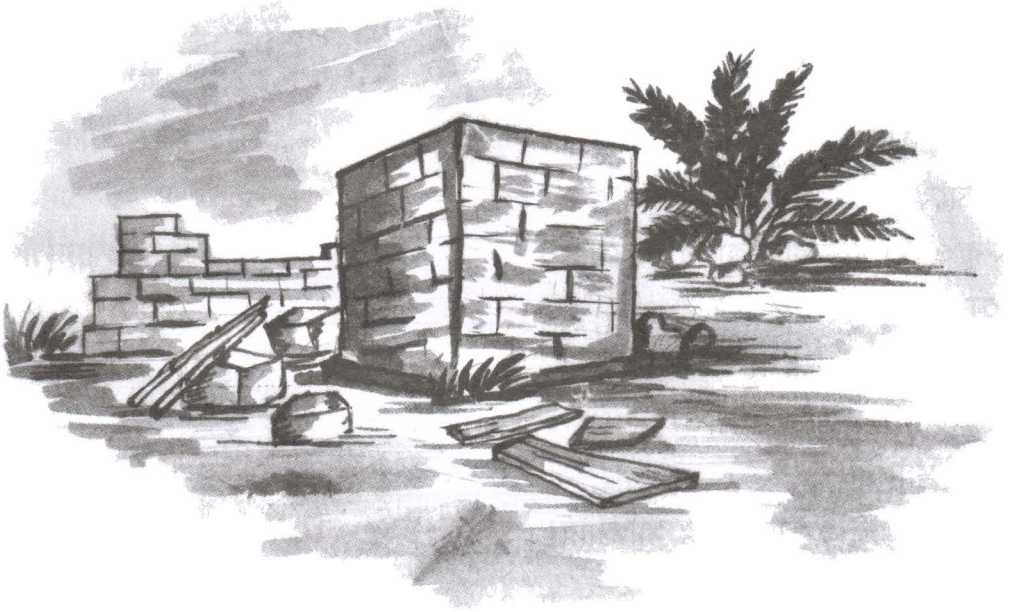
এভাবে আওয়াজ বাড়তে লাগলো। উত্তেজনা উত্তাপ ছড়াতে লাগলো। সবাই উচ্চকণ্ঠ হতে লাগলো। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সব গোত্র তীর-তূণীর আর

ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো! যুদ্ধটা বুঝি বেধেই যায়! কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান মনে হচ্ছে অনে-ক দূরে, কিংবা অসম্ভব।

✺ ✺ ✺

আমি ভীষণ অসহায় বোধ করতে লাগলাম। কারণ, কারণটা-যে আমিই! যুদ্ধ যদি বেধেই যায়, রক্ত যদি বয়েই যায়, তাহলে আমি-যে লজ্জায়-আফসোসে একেবারে এতোটুকু হয়ে যাবো! পরিস্থিতি যতোই যুদ্ধের দিকে মোড় নিচ্ছে আমার অস্থিরতা ততোই বাড়ছে। কী করবো এখন আমি? পাথর হয়ে কী-করে মানুষকে শান্তির পথে আনবো? হঠাৎ মনে হলো, দু'আ তো করতে পারি! আমার রবের কাছে মিনতি তো জানাতে পারি! তিনি আমার তাসবীহ্ শোনেন, তাহলে তো দু'আও শুনবেন! অবশ্যই শুনবেন!

শুরু করলাম দু'আ—

'আমার আল্লাহ!

ওদেরকে সুমতি দাও!

ফেরাও ওদেরকে এ অকারণ যুদ্ধ থেকে!

ওদেরকে এক করে দাও!

ওদেরকে নেক করে দাও!

ওদের মাঝে ঐক্য এনে দাও!

আমার মালিক!

ওরা-যে সবাই এখন কা'বার আঙ্গিনায়!

মসজিদুল হারামে!

নিরাপত্তা ও শান্তির জায়গায়!

এখানে যে আসে সেই-না নিরাপদ!

তবে কেনো এই যুদ্ধ-যুদ্ধ ডঙ্কা?

কেনো এই বেসামাল উত্তেজনা?

আল্লাহ, আমার আল্লাহ!

রহম করো! দয়া করো! ...'

হঠাৎ কানে এলো, একটি বুদ্ধিদীপ্ত গম্ভীর কণ্ঠ—
'হে সম্প্রদায়!
হে উন্মত্ত জনতা!
এ কী উন্মাদনা?
জানো কি, কী এর পরিণতি?
জানো, কোথায় গিয়ে ঠেকবে,
এ-উত্তেজনার জের?
এই 'হারামে' দাঁড়িয়ে তোমরা লড়াই করতে চাও?
তোমরা কি বিবেকের মাথা খেয়েছো!
সাবধান! ক্ষান্ত হও! সংযত হও!
বিবেককে জাগ্রত করো!
যুক্তির কাছে ফিরে এসো!
শয়তানকে বিতাড়িত করো!
মিমাংসায় আসো! আসতেই হবে!!'

তার কথায় বেশ কাজ হলো। উত্তেজনা হ্রাস পেলো। একজন বললোঃ
-বলুন তবে, আমাদের কী করতে হবে!
তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেনঃ
-আমার প্রস্তাব হলো, যে ব্যক্তি আমাদের নিকট এই 'সাফা প্রবেশদ্বার' দিয়ে প্রথম প্রবেশ করবে, তাকেই আমরা মিমাংসাকারী হিসাবে মেনে নেবো। তার কথাই হবে আমাদের কথা। তার মতই হবে আমাদের মত। আমরা মনে করবো, আল্লাহ-ই তাকে পাঠিয়েছেন!'

সবাই তার প্রস্তাব পছন্দ করলো। মুহূর্তেই উত্তেজনা দূর হয়ে গেলো। সবাই শান্ত হলো। আমার অস্থিরতাও দূর হলো। এই ভেবে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেছেন!

* * *

এবার অপেক্ষার পালা। সবাই অপলক চোখে 'সাফা প্রবেশদ্বার'-এর দিকে তাকিয়ে রইলো। এই বুঝি আসছে কেউ! চলতে লাগলো অপেক্ষা। গড়াতে লাগলো প্রতীক্ষার অধীর প্রহর। সবাই মনে প্রাণে চাইছিলো, আগমনকারী যেনো হয় সুবিচারক ও সুবিবেচক এবং বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। যাতে সবাই মেনে নিতে পারে তার বিজ্ঞোচিত প্রাজ্ঞোচিত ফায়সালা। আমিও সবার সাথে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সময় সামান্যই গড়িয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছিলো, কতো কাল বুঝি পেরিয়ে গেছে! অপেক্ষার সময় এমন দীর্ঘই মনে হয়। হঠাৎ একজন হর্ষধ্বনি করে উঠলো:

-ঐ যে, কে যেনো আসছে!

সবাই তাকালো উদয়ের পথে। আমিও তাকালাম। এক যুবক এগিয়ে আসছে। কাছে, আরো কাছে। এবার সবাই তাকে চিনলো। আমিও। সবাই আনন্দ-উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো:

-আরে, এ-যে আমাদের প্রিয় আল-আমীন! মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ!'

সবার অলক্ষ্যে আমি আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠলাম— আল-হামদুলিল্লাহ! শোকর তোমার হে আল্লাহ!

এবার কথা বললেন সেই বুদ্ধিমান প্রবীণ ব্যক্তিটি:

-এখন বলো, তোমরা কি আল-আমীনের ফায়সালা মেনে নেবে?

সবাই এক বাক্যে উত্তর দিলো:

-অবশ্যই, আমরা সবাই রাজি! আল-আমীন যা বলবে তাই হবে!

মুহাম্মদ আসতেই তিনি বললেন:

-মুহাম্মদ! আমরা সবাই মিলে কা'বার পুনঃনির্মাণ কাজ শেষ করেছি। সব গোত্রই পাহাড় থেকে পাথর এনেছে। এ কাজে অংশ নিয়েছে। এখন বাকী আছে শুধু হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন করা (জায়গা মতো রেখে দেওয়া)। এখানেই গোল বেধেছে। এখানে এসেই আমরা মারাত্মক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছি। সব গোত্রই একসঙ্গে হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপনের সম্মান লাভ করতে যাচ্ছে, যা কিছুতেই সম্ভব না।

এখন বলো, আমরা কী করবো? আমরা সবাই মিলে তোমাকেই ফায়সালার দায়িত্ব দিলাম!

মুহাম্মদ আমার দিকে তাকালেন।

তারপর বিবদমান গোত্রগুলোর দিকে তাকালেন।

নীরবে কিছুক্ষণ ভাবলেন।

তারপর একটি চাদর আনালেন।

তারপর নিজ হাতে আমাকে চাদরে রাখলেন।

তারপর গোত্রপতিদেরকে বললেন:

-আসুন! কাপড়ের প্রান্ত ধরে আমার সাথে চলুন!

তাই হলো! এভাবেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। সবাই আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্মান লাভ করলো, কোনো গোত্রই বাদ পড়লো না। কাপড়টি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার পর এবার আল-আমীন নিজেই আমাকে আমার জায়গায় স্থাপন করলেন—বসিয়ে দিলেন!
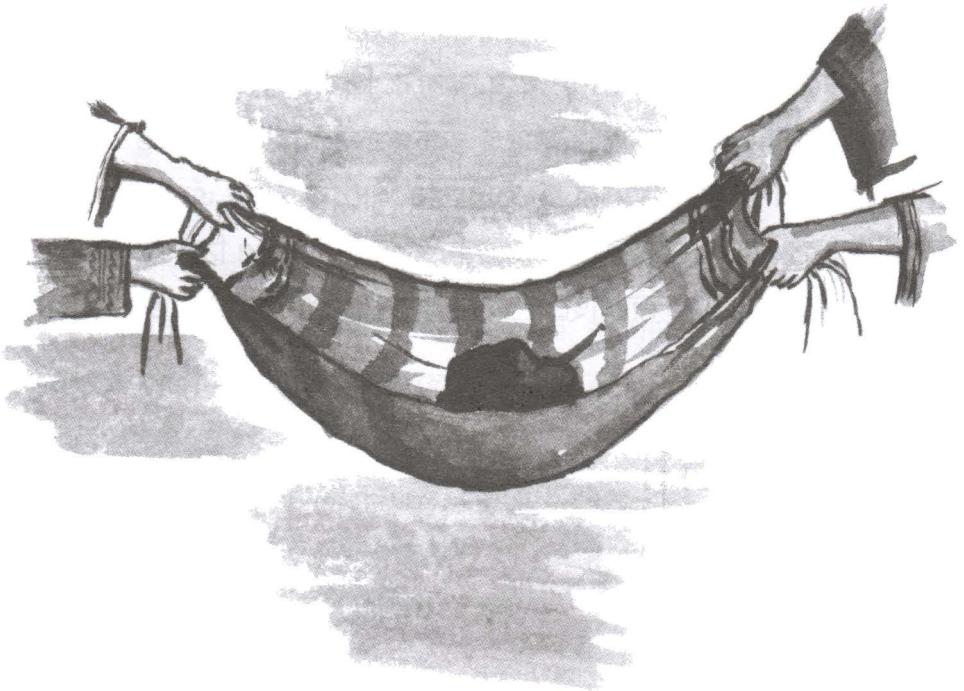
আল-আমীনের বুদ্ধিদীপ্ত অথচ সাদাসিধে ফায়সালায় সবাই সীমাহীন মুগ্ধ হলো! আমি নিজেও ভীষণ অবাক হলাম! এমন বুদ্ধি অন্য কারো মাথায় কেনো খেললো না? অথচ এখানে হাজির বাঘা বাঘা সব গোত্রপতি! তবে কি আল-আমীন সবার সেরা— বুদ্ধিতে যুক্তিতে প্রজ্ঞায় বিচক্ষণতায়?!

হ্যাঁ, এভাবেই আল-আমীনের বুদ্ধিদীপ্ত ফায়সালায় একটি নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে সবাই রক্ষা পেলো। দূর হয়ে গেলো নিজেদের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদ ও হিংসা-হানাহানি। বরং তার বদলে জায়গা করে নিলো— 'সবাই মিলে করি কাজ'-এর অনাবিলতা ও স্বচ্ছতা। কী সুন্দর ফায়সালা! কেউ বঞ্চিতও হলো না আবার কেউ এককভাবে শ্রেষ্ঠত্বও কেড়ে নিতে পারলো না। আমাকে যথাস্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়ার এ-সম্মানে সবাই হয়ে গেলো সমান ভাগীদার।

✱ ✱ ✱

বন্ধু! এখনো আমি আছি কা'বায়—আমার নির্দিষ্ট জায়গাটায়। আমাকে দেখতে পাবে তুমি কা'বার আঙ্গিনায় এলেই, মক্কার মানুষের মতো। অসংখ্য হজ্ব ও উমরাপালনকারীর মতো। না, কোনো বাধা নেই। চলে আসতে পারো একেবারে আমার কাছে। এঁকে দিতে পারো আমার গায়ে ভালোবাসার উষ্ণ চুমু-চিহ্ন! আর শোনো! ওখানে দাঁড়িয়ে অবশ্যই মনে করবে প্রিয় আল-আমীনের সেই মহা ফায়সালার ঘটনাটি। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বিচক্ষণতালব্ধ বিজ্ঞোচিত ফায়সালার ঘটনাটি। তারপর আল-আমীনের ভালোবাসায় আরেকটি চুমু এঁকে দিয়ো আমার কালো গায়ে! কী সৌভাগ্য হবে তোমার, যদি তোমার চুমুটিও ঠিক সেখানেই এঁকে দিতে পারো, যেখানে এঁকে দিয়েছিলো আল-আমীনের পবিত্র ঠোঁট! তাই যেনো হয়! বারবার যেনো হয়!!

একটি রাতের আত্মকাহিনী

সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। চারদিকে শুধু অন্ধকার। আকাশে বসেছে মিটিমিটি তারার মেলা। না, আকাশে তখন চাঁদ ছিলো না। কারণ আমি ছিলাম 'চাঁদ মাস—রমজানের' শেষ সপ্তাহের একটি রাত। আজও মক্কা ও আরব উপদ্বীপের মানুষ আমাকে স্বাগত জানিয়েছে গতানুগতিকভাবে—অন্যান্য রাতের মতোই। কেউ জেগে আছে, গল্প করে, হৈ হুল্লোড় করে সময় পার করছে। কেউ-বা আবার নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। থাক সে কথা; এখন আমার পরিচয়টা আরেকটু পরিস্কার করে বলি—

আমি একটি রাত—মহিমান্বিত রাত। আমার জন্মলগ্ন থেকেই দুনিয়া আমার অপেক্ষায় বসে ছিলো। আমি তো আর যেই-সেই রাত নই! আমার ফযিলত ও মর্যাদা এবং শান ও মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ আলাদা। আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে শুধু নূর আর নূর—আলো আর আলো। এ নূর বা আলো মোটেই সূর্য থেকে পাওয়া নয়, চাঁদের আলোর মতোও নয়। না, কোনো 'কৃত্রিম' আলোর ফুলঝুরিও নয়। এ নূর ও আলো সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এ নূর হলো আল্লাহ্‌র নূর, যা পৃথিবী বলো আর আকাশ বলো সবকিছুকে আলোকময় করে তোলে। হ্যাঁ, এ নূরের বরকতেই আমি হয়ে গেছি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম! তিন হাজার দিনের চেয়েও সেরা। ছয় সহস্র দিবা-রাত্রির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তিরাশি বছরের চেয়েও উত্তম!

এখন চিনতে পারছো?

আমি লাইলাতুল কদর—মহিমান্বিত রজনী!!

আমার জন্ম রমজান মাসে। ৬১০ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ হিজরী সন আরাম্ভ হওয়ার ১৩ বছর পূর্বে। যেদিন আল-আমীন নবী হয়েছেন—তাঁর উপর প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে, সেদিনই আমার জন্ম। এখন মনে হয় আমাকে চিনতে পেরেছো!

আরো বিস্তারিত বলছি—

মক্কার অদূরে একটা গুহা আছে—গারে হেরা। মুহাম্মদ প্রায়ই ওখানে ছুটে যেতেন। তিনি একটা লম্বা সময় সেখানে অবস্থান করতেন। লা-শরীক আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করতেন। ইবাদত-সাধনায় ডুবে থাকতেন। কিন্তু অপরদিকে সারা মক্কা তখন ডুবে ছিলো বুত-সাধনায়—মূর্তিপূজায়।

আমার যখন জন্ম তখন মুহাম্মদের বয়স চল্লিশ হয়ে গেছে। এই গারে হেরাতেই সেদিন তিনি ইবাদতে মগ্ন। তাহাজ্জুদে সমাহিত (গভীর মনোযোগী, নিমগ্ন)। অশ্রুময় মুনাজাতে সমর্পিত। তিনি দু'হাত তুলে ডাকছিলেন আল্লাহ্‌কে যে-ভাষায়, তার ভাব যেনো এই—
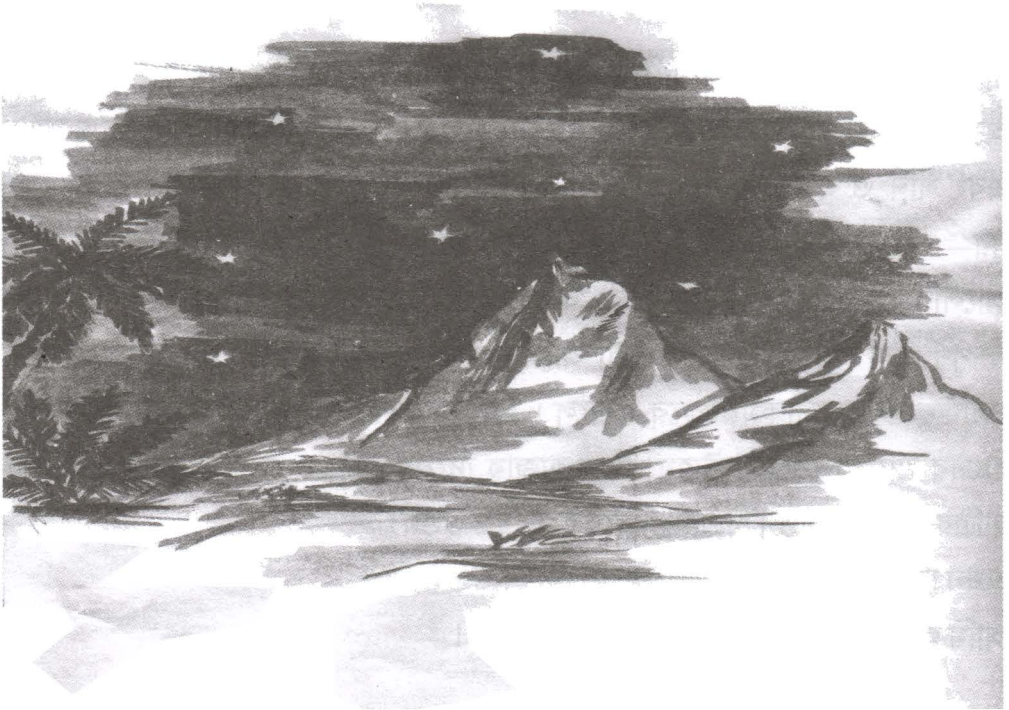
'হে পৃথিবীর মালিক! হে আকাশের রব! তুমিই তো সৃষ্টি করেছো চাঁদ-সুরুজ! তারায় ভরা ঐ রাতের আকাশ! এই পাহাড়-পর্বতও তোমারই সৃষ্টি! সবকিছুই তোমার সৃষ্টি! আমিও তোমার সৃষ্টি! তুমি আমারও স্রষ্টা! হে আমার রব! আমি তোমাকে চাই, শুধুই তোমাকে!'

হ্যাঁ, যখন চলছিলো এই গভীর মুনাজাত ও সকাতর দু'আ তখনই নূরে নূরে ভরে গেলো কুল মাখলুকাত। আলোয় আলোয় ছেয়ে গেলো সৃষ্টিলোক। আকাশে আলো। জমিনে আলো। সবখানে আলো। এই হেরা গুহায় সবচে' বেশী আলো। তখন আসমানের এক ফেরেশতা নেমে এলেন। তিনি ফেরেশতাকুল সরদার—হযরত জিবরীল। সাথে নিয়ে এলেন সবচে' সুন্দর, সবচে' শ্রেষ্ঠ, সবচে' মহান কিছু কথা, যা এই প্রথম শুনলো দুনিয়া! তিনি মুহাম্মদকে বললেন:

-পড়ুন!

উত্তরে মুহাম্মদ বললেন:

-আমি পড়তে জানি না!

তখন হযরত জিবরীল মুহাম্মদের কাছে এলেন। তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। একবার। দুইবার। তিনবার। প্রতিবারই বলছিলেন:

-পড়ুন!

মুহাম্মদও প্রতিবার উত্তরে বলছিলেন:

-আমি তো পড়তে জানি না!

অবশেষে হযরত জিবরীল তিলাওয়াত করলেন—

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنـــسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. ﴾

'পড়ো তোমার রব-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাধা রক্ত থেকে। পড়ো। তোমার রব বড়ো দয়ালু। যিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে জানিয়েছেন সে কথা যা সে জানতো না।'
-সূরা আলাক

এবার মুহাম্মদও হযরত জিবরীলের সাথে সেই বাণী আওড়াতে লাগলেন। এরপর জিবরীল চলে গেলেন। মুহাম্মদ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ছুটে গেলেন। খাদিজার কাছে ফিরে গেলেন। ভয়ে কাঁপছিলেন তিনি। কপাল থেকে টপটপ বেয়ে পড়ছিলো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। হযরত খাদিজা তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। উদ্বেগভরে শিয়রে বসে রইলেন। ধীরে ধীরে মুহাম্মদ যখন শান্ত হলেন তখন খাদিজাকে একে একে সব খুলে বললেন। তাঁকে বললেন, কেমন করে হেরা গুহা আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, অথচ গুহাটা ছিলো অন্ধকার। কেমন করে জিবরীল তাঁর কাছে এসে তাঁকে পড়তে বললেন। তারপর তিনি তাঁকে একে একে তিনবার আলিঙ্গন করার—বুকে চাপ দেয়ার কথা জানালেন। আরো জানালেন, প্রথমে তিনি কী বলেছেন এবং জিবরীল কী করেছেন। আর সব শেষে কেমন করে জিবরীলের সাথে সাথে সেই বাণী তিনি আওড়েছেন! এরপর মুহাম্মদ সেই বাণী হযরত খাদিজাকেও একবার পড়ে শোনালেন।

হযরত খাদিজা মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেনঃ

-ভয়ের কিছু দেখছি না! আল্লাহই আপনার সহায়। আপনি অনেক ভালো মানুষ। অনেক দয়ালু মানুষ। পরিবারকে কতো ভালোবাসেন আপনি। জীবনে কখনো মিথ্যা বলেন নি। সবাইকে সহযোগিতা করেন। সবার হক আদায় করেন। আপনি তো মহান চরিত্রের অধিকারী। সত্যবাদী। বিশ্বস্ত। কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে না। কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না।

✷ ✷ ✷

খাদিজা নিজে যা বলার তা তো বললেন। যেভাবে পারলেন সেভাবে বললেন। অনেক সান্ত্বনা দিলেন। এবার নিজে আরো আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে এবং প্রিয় আল-আমীনকে আরো ভয়মুক্ত করার জন্যে তাঁকে নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে। তিনি ছিলেন ভীষণ জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ মানুষ। আসমানী কিতাব—তাওরাত-ইঞ্জিল তার বেশ পড়া ছিলো। ধর্ম বিষয়ে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি। এ জন্যে মূর্তিপূজা ছিলো তাঁর ভীষণ অপছন্দ। ওয়ারাকা ইবনে নওফল মুহাম্মদের কাছে হেরা গুহায় ঘটে-যাওয়া সবকিছু শুনলেন, উৎকর্ণ

হয়ে, তন্ময়চিত্তে। আর ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠতে লাগলো কী যেনো এক প্রাপ্তির হাসি! অদ্ভুত এক তৃপ্তির হাসি! সুন্দর এক মধুর হাসি! অজানা এক দিগন্তের উদ্ভাস! অজানা বলছি কেনো? জানাই তো! তাই তো মুহাম্মদের পক্ষ থেকে শোনা যখন শেষ তাঁর পক্ষ থেকে সুসংবাদ তখন শুরু! এবং এভাবে—

'ভাতিজা! সুসংবাদ! তোমার উপর আসমানী ওহী নাযিল হয়েছে! তুমি নবী হয়ে গেছো! এ-উম্মতের নবী! আরবের নবী! আজমের নবী! সারা পৃথিবীর নবী! তুমি এখন মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের মতো! তোমাকে আল্লাহ নবী বানিয়েছেন মানুষকে হিদায়াতের রাস্তা বলে দিতে! কল্যাণের ভালোবাসার ও রহমতের সবক শেখাতে! প্রথম দিকে মানুষ বিশ্বাস করতে চাইবে না তোমাকে! এমনকি তোমাকে তোমার দেশ—এ-মক্কা থেকেও ওরা বের করে দেবে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার ধর্মই বিজয়ী হবে। তোমাকে ধর্মের পথে অনেক
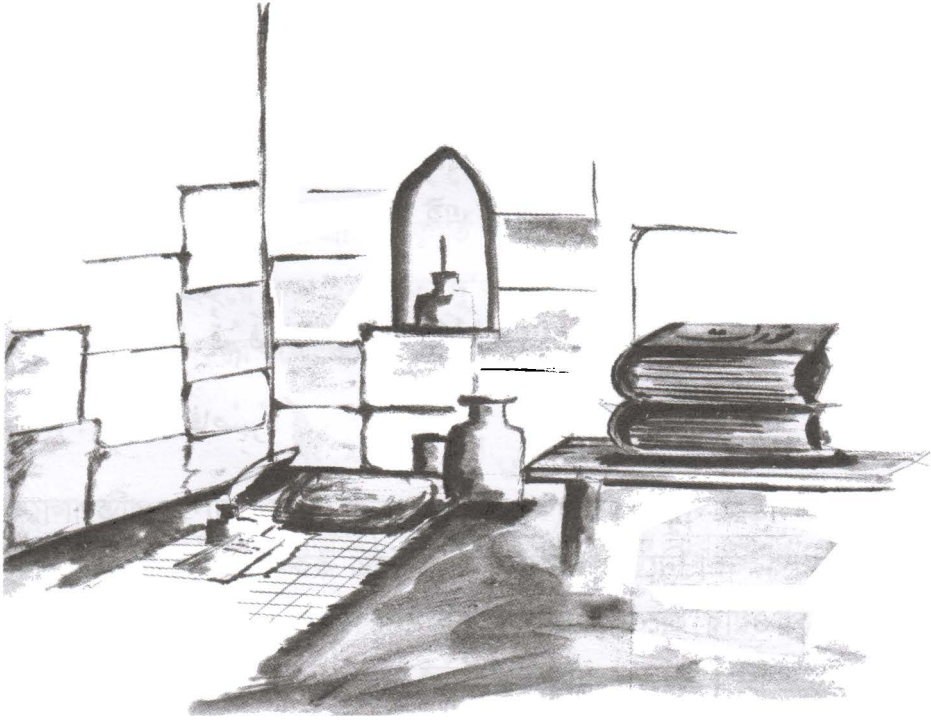
যুদ্ধও করতে হবে। হায়! আমি যদি বেঁচে থাকতাম, তোমাকে অনেক সাহায্য করতাম!

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার আরো শান্ত হলেন। আরো আশ্বস্ত হলেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কথা তাঁর ভীষণ ভালো লাগলো। যে-ওহীর আগমনে তিনি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এখন সে-ওহী যেনো আবার আসে, বারবার আসে এবং আমার মতো রাত্রি যেনো আরো আসে, সে জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। প্রায়ই তিনি ছুটে যেতেন উঁচু পাহাড়ে এবং গুহায়— সেই ওহীর আশায়, সেই ওহীর ব্যাকুলতায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার ওহী আসতে দেরী হচ্ছিলো। সে জন্যে তাঁর উদ্বেগের কোনো কূল রইলো না। দুশ্চিন্তার কোনো সীমা রইলো না।

না, বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় নি। আবার এলো তাঁর কাছে ওহী। আবার এলো আসমানী দূত—হযরত জিবরীল। এবারও ঠিক আগের মতোই তাঁর সারা গায়ে কম্পন সৃষ্টি হলো। তিনি দরদর করে ঘামতে লাগলেন। তিনি খাদিজাকে বললেন:
-খাদিজা! আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও! তাড়াতাড়ি ঢেকে দাও!
খাদিজা তাঁকে ঢেকে দিলেন। রাসূল শুয়ে আছেন। খাদিজা পাশে বসে আছেন। ঠিক তখনই ভেসে এলো আসমানী দূতের কণ্ঠে এই আয়াতগুলো, যা শুধু তিনিই শুনতে পাচ্ছিলেন—

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ﴾

'হে চাদর আবৃত! উঠে পড়ুন এবং (মানুষকে) সতর্ক করুন। আপন প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। নিজের পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র করুন। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। বেশি পাওয়ার জন্যে কাউকে কিছু দেবেন না। আপন প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্যে সবর করুন।' -সূরা মুদ্দাসসির

এরপর ওহী নাযিল হচ্ছিলো একের পর এক। আয়াতের পর আয়াত। সবশেষে নাযিল হলো এই আয়াত

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا . ﴾

'আজ আমি তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের দীন। আর পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্যে আমার নেয়ামতসমূহ এবং দীন হিসাবে আমি তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম একমাত্র ইসলামকেই।' -সূরা মায়েদা

সারা জীবন আমি —কদরের রাত— গর্ব করে বেড়াবো। কেননা ওহী নাযিলের সূচনা-রাত্রি ছিলাম আমি। আমার একান্ত নিজস্ব প্রহরে আকাশ থেকে নেমেছিলো কুরআন। অনাগত দিনে কতো মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে এ-প্রশ্ন— কুরআন কখন নাযিল হতে শুরু করেছে? উত্তর একটাই, লাইলাতুল কদরে—কদরের রাতে। মহিমান্বিত রজনীতে। আল্লাহ আমাকে কতো সম্মান দিয়েছেন! তিনি কুরআনে আমার আলোচনা করে আমার শান ও মর্যাদাকে কতো বাড়িয়ে দিয়েছেন! আমাকে 'এক বরকতময় রজনী' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ সারা বছর আমার জন্যে অধীর অপেক্ষায় বসে থাকে। রমজানের শেষ দশকে খুঁজে বেড়ায় আমাকে, বেলায় অবেলায়। খুঁজবেই তো! তারা-যে জানে যখন আমি আসি, নূরের পসার নিয়ে আসি! আমার প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রহর নূরে নূরে ছাওয়া। বরকতে বরকতে ঘেরা। এ-সব প্রহরে করা হয় যতো দু'আ, স-ব কবুল করেন আমার মাওলা! এই দেখো, কী সুন্দর করে বলেছেন আমার কথা আমার আল্লাহ—

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة مُبَارَكَة. ﴾

'নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে ।' -সূরা দুখান

শুধু একটি আয়াতের কথা বলছি কেনো? আমার মালিক তো আমাকে নিয়ে পূর্ণ একটি সূরাই নাযিল করেছেন! সূরাতুল ক্বদর। কী সৌভাগ্য আমার! পড়ো-না একটু সূরাটি!

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. ﴾

'আমি তো কুরআন নাযিল করেছি কদরের রাতে। জানো কি, কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও সেরা! সে রাতে ফেরেশতারা এবং জিবরীল নেমে আসেন, তাদের রব-এর নির্দেশে— সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে। কদরের রাত, সে তো শান্তি আর নিরাপত্তা— একেবারে ভোরের আলোক রেখা ফুটা পর্যন্ত।' -সূরা কদর

আমি এক থোকা আঙুর

আমি এক থোকা আঙুর। ঝুলে আছি বাগানের লতানো শাখায়, তায়েফ নগরীতে। এ-বাগানটা উতবা বিন রবী'আ এবং তার ভাই শায়বা বিন রবী'আর। ওরা মালিক হলেও বাগানের সার্বক্ষণিক দেখাশোনায় নিয়োজিত ছিলো 'আদ্দাস' নামের এক মালী। বড়ো ভালো মানুষ তিনি। তার নিরলস যত্নেই বাগানটা প্রাণময়, সজীব।

আঙুরের লতাগুল্ম কী সুন্দর লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে। ছড়িয়ে পড়েছে মাচানময়। এই লতায়িত মাচানের নিচে ঝুলে ঝুলে আমি একটা স্বপ্ন দেখে চলেছি। বলবো তোমাকে মধুর সে স্বপ্নের কথা! অমন স্বপ্নের কথা বলতেও তো মধু-মধু লাগে! শোনোই তাহলে—
আমার স্বপ্নটা হলো, প্রিয় মুহাম্মদকে একটিবার দেখা। চোখভরে .. মনভরে।
এ-মুহূর্তে আমি ভীষণ খুশি। ভীষণ উত্তেজিত। হর্ষোচ্ছ্বাসে প্লাবিত। মনের হরষে (আনন্দে) আমার লতাগুল্মরা কাঁপছে। কারণ জানতে চাও! কারণ হলো আমার স্বপ্নটা একেবারেই আমার 'হাতের' কাছে! অর্থাৎ?! অর্থাৎ আমি জানতে পেরেছি প্রিয় মুহাম্মদ এখন তায়েফে! আহা! আমি যদি তাঁর কাছে চলে যেতে পারতাম উড়ে উড়ে কিংবা ভেসে ভেসে! কিংবা অন্যভাবে! কিন্তু সে তো আর হবার নয়! তাহলে আমার স্বপ্ন? সে কি বাস্তবায়িত হবে না? আমার 'টসটসে' বিশ্বাস; বাস্তবায়িত হবে, হবেই! অমন মধু-স্বপ্ন দেখার তাওফিক যখন হয়েছে, বাস্তবায়নের মুখ দেখার ভাগ্যও হবে!

এবার এসো খোঁজ নিই, প্রিয় নবী কেনো এলেন তায়েফে—

তিনি এসেছেন তায়েফের বনু সাক্বীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিতে। তাঁর তায়েফ সফরটা হয়েছে বেশ গোপনে— সবার অলক্ষ্যে। তাঁর মনের আশা, বনু সাক্বীফ তাঁকে হতাশ করবে না, কুরাইশ যা করেছে তারা তা করবে না। বরং তারা তাঁকে গ্রহণ করবে। তাঁর দাওয়াত কবুল করবে। তাঁর ডাকে সাড়া দেবে। কেননা এরা কোরাইশ গোত্রের চেয়ে কম জাত্যভিমানী (বংশ ও কুল নিয়ে গর্ব করে যারা) এবং ওদের তুলনায় এদের বুদ্ধিশুদ্ধিও একটু বেশী।
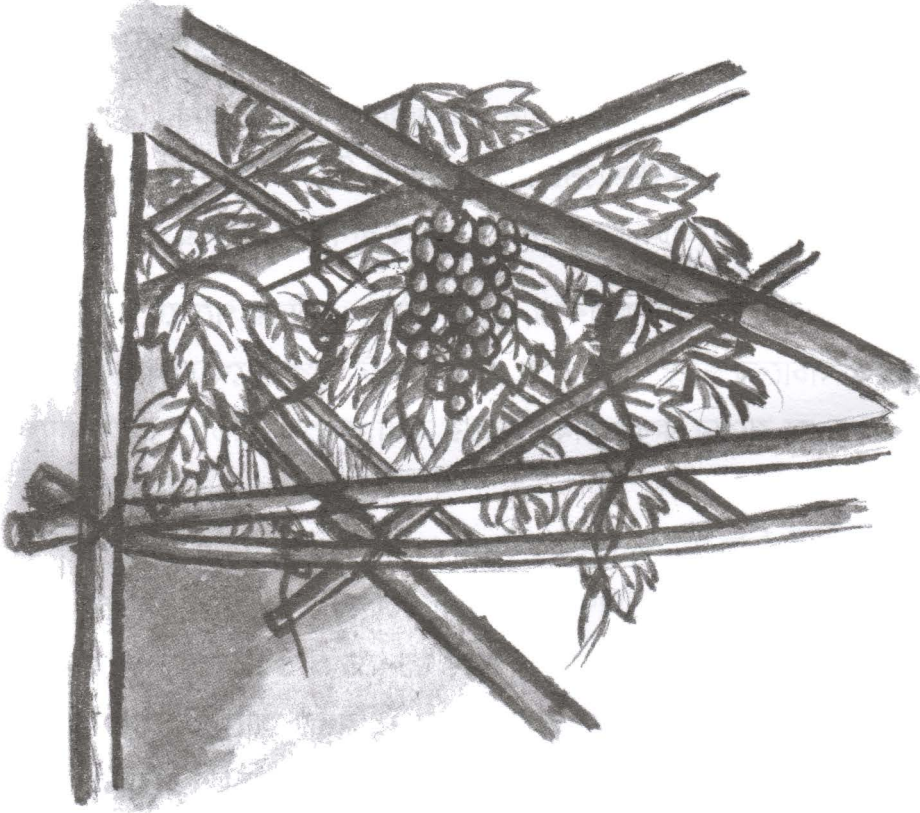
আমার জন্মের পর যখন আমি ছোট্ট একটা লতে ফুটফুট কলির মতো—ছোট ছোট কাঁচা আঙুর, সেই থেকেই আমি শুনে আসছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, আমার ছায়ায়-বসা মানুষের মুখে মুখে।

আমি জানতে পেরেছি, তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন—
পুরুষদের ভিতরে হযরত আবু বকর,
মহিলাদের ভিতরে হযরত খাদিজা,
কৃতদাসদের মধ্যে হযরত যায়দ ইবনে হারিসা,
বালকদের মধ্যে হযরত আলী।

আমি আরো জানতে পেরেছি, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন তাদের সংখ্যা বেশী না—খুব অল্প। অধিকাংশ কোরাইশই ঈমান আনে নি। এরা বরং প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পর প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে লাগলো। সেই সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ তো আছেই। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত বন্ধ হলো না। শত বাধা ও বিদ্রূপের ঝড় উপেক্ষা করে আরো জোরেশোরে দাওয়াতের কাজ চলতে লাগলো। ফলে কোরাইশ কৌশল বদল করলো। মুহাম্মদকে লোভের জালে আটকানোর চেষ্টা করলো। ওরা তাঁকে সম্পদ ও রাজত্বের লোভ দেখালো। কিন্তু বড়ো ভুল করলো ওরা। ওরা কি জানে না, মুহাম্মদ কখনোই লোভ-কাতর ছিলেন না? আমার নিচে-বসা এক লোকের মুখে শুনেছি, তারা নাকি আবু তালিবের কাছে দূত পাঠিয়ে জানিয়েছে মুহাম্মদ যা চাইবে আমরা তাই দেবো। বিনিময়ে মুহাম্মদকে এ-নতুন ধর্ম ছাড়তে হবে! আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা বন্ধ করতে হবে!

আবু তালিব মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ-কথা জানানোর পর তিনি পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন—

-চাচাজান! ওরা যদি আমার ডান হাতে আকাশ থেকে সূর্যটাকে এনেও রেখে দেয় আর বাম হাতে নামিয়ে আনে চন্দ্রটাকে, আর বিনিময়ে আমাকে ইসলামের দাওয়াত ছেড়ে দিতে বলে, তবুও আমি তা ছাড়বো না, মুহূর্তের জন্যেও না। যতোদিন না আল্লাহ এই দাওয়াতকে বিজয়ী করবেন অথবা আমি নিজেই এই দাওয়াতের পথে শহীদ হয়ে যাবো!

✵ ✵ ✵

আমার মনিব (আঙুর বাগানের মালিক) উতবার মুখে আমি শুনেছি, একবার কোরাইশ গোত্র তাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রতিনিধি

হিসাবে পাঠিয়েছিলো কিছু আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়ে। মনিব তখন সে-সব প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। গিয়ে তাঁকে বললেন:

-মুহাম্মদ! তুমি আসলে কী চাও, একটু বলবে? সম্পদ চাইলে কোরাইশ গোত্র তোমার পায়ের কাছে দিরহাম-দীনার ঢেলে দেবে, তুমিই হয়ে যাবে মক্কার সেরা ধনী! আর যদি বলো তোমার সম্মান চাই, তারা তোমাকে সম্মানিত নেতা হিসাবে বরণ করে নিতে এক পায়ে খাড়া! আর যদি রাজত্ব তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তারা তোমাকে রাজাও বানাবে! এ ছাড়া যদি মনে করো তোমার মাঝে কোনো 'মানসিক বিকার' দেখা দিয়েছে, তাহলে তাও আমাদেরকে বলো, আমরা দুনিয়ার বড় বড় চিকিৎসকদেরকে এনে জড়ো করবো, তোমাকে সুস্থ করে তোলবো! ..

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উতবার কথা শুনলেন। জবাবে মুখে কিছুই বললেন না, শুধু এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ.

'বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার কাছে ওহী আসে এমর্মে যে তোমাদের ইলাহ শুধুই এক ইলাহ।' -সূরা কাহ্‌ফ

উতবা এ-জবাব শুনে ফিরে এসেছিলেন মাথা নুইয়ে। এসে অপেক্ষমান কোরাইশ নেতাদেরকে বলেছিলেন:

-আমি এমন কথা মুহাম্মদের কাছে শুনে এসেছি যা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, গণকের ভবিষ্যদ্বাণীও নয়!

এরপর উতবা কোরাইশকে অনুরোধ করে বললো:

-তোমরা মুহাম্মদকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিলে ভালো হয়! মুহাম্মদকে তো তোমরা সেই ছোট্ট বেলা থেকেই জানো! তোমরাই-না বলতে তোমাদের মধ্যে উন্নত চরিত্রে, সত্যবাদিতায় ও আমানতদারীতে তার কোনো জুড়ি নেই! আজ যখন সে বড় হলো এবং তোমাদের কাছে একটা বিশেষ দাওয়াত নিয়ে এলো, তখন 'সেই' তোমাদের চোখেই কেনো এখন সে হয়ে গেলো মিথ্যাবাদী ও যাদুকর?!

✵ ✵ ✵

না, কোরাইশের কোনো প্রলোভনই কাজে এলো না। তাঁর দাওয়াত চলতে লাগলো আপন গতিতে। কোরাইশও বসে থাকলো না, তাঁর দাওয়াতের কাজে বাধা দিতে লাগলো। তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন শুরু করলো। এমনকি তাঁকে এবং অন্যদেরকে বয়কট করার, অবরুদ্ধ করে রাখার ঘোষণা দিলো। নিজেরা নিজেরা একটা চামড়ার টুকরোয় কিছু অনৈতিক ও অন্যায় কথা লিখে কা'বার দেয়ালে টানিয়ে দিলো। সবাইকে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার কঠোর নির্দেশ দিলো। ওদের লিখা কথাগুলো ছিলো অমানবিকতায় ভরা। নির্দয়তায় ঠাসা। সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কালো চিন্তায় কুৎসিত। লক্ষ্য করো কয়েকটি কথা—

- ▷ মুসলমানদের সাথে কোনো সালাম-কালাম চলবে না।
- ▷ তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ।
- ▷ তাদের সাথে বিবাহ শাদী নিষিদ্ধ।
- ▷ কোনো রকম লেনদেনও চলবে না।

হ্যাঁ এভাবেই ওরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদেরকে দিনের পর দিন .. মাসের পর মাস .. বরং বছরের পর বছর—একাধারে তিন বছর অবরুদ্ধ করে রাখলো। এর মাঝে যতো রকম নিষ্ঠুরতা আছে সবই প্রদর্শন করলো। শিশু-নারী-বৃদ্ধরা সামান্য খাবারের জন্যে প্রচণ্ড কষ্ট করলো। বড়রা খাবার না পেয়ে খেলো— গাছের পাতা এবং আরো কতো 'অখাদ্য'।

তবুও ঈমান কারো টললো না।

মনোবল কারো ভাঙলো না।

তাওয়াক্কুল কারো কমলো না।

চেতনা কারো নিভলো না।

বিবেক কারো নুইলো না।

✺ ✺ ✺

সুতরাং এ-বয়কট ও অবরোধ কোনো কাজে এলো না। শুধু কষ্ট পেলো একদল নিরপরাধ মানুষ—অসহায় শিশু-নারী-বৃদ্ধ। ওদের অমানবিক কষ্টে লজ্জা পেলো মানবতা। কিন্তু লজ্জা পেলো না পাষাণদিল কোরাইশ। তবে তিন বছর গড়িয়ে যাওয়ার পর কোরাইশের ভিতরের পাঁচজন শীর্ষস্থানীয় মানুষের ঘুমন্ত মানবতা জেগে উঠলো। তারা বললো— 'আমরা আর মানি না এই অবরোধ, এই চুক্তি! কেনো কষ্ট পাবে এতোগুলো নিরপরাধ মানুষ!' এই বলে তারা কা'বায় টানানো চামড়ার টুকরোটি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেললো!

✺ ✺ ✺

অবরোধ শেষ হলো।

কিন্তু জুলুম-নির্যাতন বন্ধ হলো না।

বরং আরো বাড়লো।

আরো নৃশংস হলো।

আরো অমানবিক হলো।

আরো পাষাণেঘেরা হলো।

আরো পাথরেচাপা হলো।
আরো কাঁটাময় হলো।
আরো পিলে-চমকানো হলো।
এর মাত্রাটা ভয়াবহ আকৃতি নিয়ে সামনে এলো চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী খাদিজার ইন্তেকালের পর। অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে ফিরে আসার পরপরই তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। প্রথমে আবু তালিব। পরে খাদিজা। তাঁরা দু'জন ছিলেন তাঁর দুর্ভেদ্য দুর্গ। বিপদের সহায়। সান্ত্বনার স্নিগ্ধ পরশ। এ জন্যেই প্রিয়-হারানোর এ-বছরটির নাম রেখেছেন নবীজী— عام الحزن বা দুঃখ-বছর। এ-বছরে না-জানি কতো দুঃখ পেয়েছেন আমাদের নবীজী!

✺ ✺ ✺

তাঁদের ওফাতের পরে নির্যাতনের কিছু নমুনা লক্ষ্য করো—

এক.

একবার আল্লাহ্‌র রাসূল নামাজ পড়ছিলেন। যেই তিনি সেজদায় গেলেন অমনি একদল কমজাত এসে তার মাথায় বকরীর নাড়ীভুঁড়ি চাপিয়ে দিলো, তারপর অদূরে দাঁড়িয়ে মজা লুটতে লাগলো।

দুই.

আরেকবার এক কাফের তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে টানতে টানতে তাঁর শ্বাস প্রায় রোধ করে ফেলেছিলো।
হায়! রাহমাতুল-লিল-আলামীনের সঙ্গে কী নিষ্ঠুরতা!!
অমন নিষ্ঠুরতার কথা শুনলে কার-না চোখে পানি আসে?!

✺ ✺ ✺

আমি এ-সব খবর শুনতাম মক্কা থেকে-আসা লোকজনের মুখে মুখে, যারা এখানে এসে আমার লতানো শাখের শীতল ছায়ায় বসতো এবং পরস্পরে আলাপ করতো। হ্যাঁ, এ-সব খবর শুনে আমি খুব কষ্ট পেতাম। আমার খুব খারাপ লাগতো। সেই থেকে আমি স্বপ্ন দেখে চলেছি মুহাম্মদকে একটিবার দেখে আমার জীবনকে ধন্য

করতে। কিন্তু পারবো কি? আমার জীবন-যে অনেক ছোট! তাঁর সাথে আমার দেখা হওয়ার পূর্বেই হয়তো কাফেররা আমাকে এ-বাগান থেকে নিয়ে যাবে তারপর আমাকে নিঙড়ে নিঙড়ে মদ বানাবে আর ওদের মাতাল আসরকে আরো মাতাল করে তোলবে, বুদ্ধি হারিয়ে আরো তীব্রতার সাথে মুহাম্মদ এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন শুরু করবে। তবুও আমি আশা ছাড়লাম না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার আশা পূর্ণ করবেন। মুহাম্মদের সাথে আমার দেখা হবেই। এতো কাছ থেকে তিনি ফিরে যাবেন না, আমাকে মাহরুম করবেন না! হে আল্লাহ্! কাছে এনে দাও আমার প্রিয় মুহাম্মদকে! আমার আর তর সইছে না!

✵ ✵ ✵

আল্লাহ্‌র কী শান!

আমার আশা পূর্ণ হলো এবং অবিলম্বেই!

আমার স্বপ্ন বাস্তব হলো এবং 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি'র মতোই!

এই-যে প্রিয় মুহাম্মদ নিজেই চলে এসেছেন আমার কাছে!

একেবারে কাছে!

এইমাত্র বসলেন তিনি আমার ছায়াতলে—আমার লতানো শাখের শীতল ছায়ায়!

হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখলাম, ধন্য হলাম! আহা, কী শান্তি! কী প্রশান্তি!!

কিন্তু এ কী!

তাঁর দেহ-যে রক্তাক্ত!

আনন্দের ভিতরেও আমি হু হু করে কেঁদে উঠলাম!

এ কী অবস্থা করেছে ওরা আমার প্রিয় নবীর!

আমার স্বপ্ন পুরুষের!

আমার প্রতীক্ষিত শ্রেষ্ঠ অতিথির!

তাঁর শরীর-যে রক্তাক্ত!

শরীর বেয়ে বেয়ে রক্ত এসে জমেছে জুতোয়!

ইস্, জুতো খুলতে কী কষ্ট হচ্ছে!

কী নিষ্ঠুর এরা!

অমন মানুষের রক্ত ঝরাতে পারে যে হাত, অবশ্যই তা নাপাক হাত!
অথচ তাঁর কোনো অপরাধ নেই!
তিনি রহমতে গড়া!
তিনি মায়ায় মোড়া!
তিনি মানবতায় ছাওয়া!
তিনি উম্মতের শ্রেষ্ঠ পাওয়া!
এসেছেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে!
হকের পয়গাম নিয়ে!
তা ওদের কাছে ভালো না লাগলে গ্রহণ না করুক!
তা না করে উল্টো কল্যাণকামী বন্ধুর সঙ্গে কেনো এই নিষ্ঠুরতা?
কেনো তাঁর রক্ত নিয়ে এই দানবীয় উল্লাস?
আহ! আমি আর সইতে পারছি না!
ভালো আচরণের কী মন্দ বদলা!

✵ ✵ ✵

ওদের কাছ থেকে হতাশ হয়ে তিনি যখন মক্কার পথ ধরলেন, তাঁর পেছনে একদল অবুঝ শিশুকে ওরা লেলিয়ে দিলো! সাথে ছিলো আরো কিছু নির্বোধ! ওরা রাসূলকে ঘিরে ধরলো। তাঁর গায়ে হাত দিলো। তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারলো। ওদের নিক্ষিপ্ত পাথরে তাঁর দেহ থেকে দরদর করে রক্ত ঝরলো। তাঁকে নিয়ে ওরা 'পাগল-বিদ্রূপে' মেতে উঠলো। ওদের হিংস্র বেষ্টনী থেকে যতোই বের হতে চাচ্ছিলেন তিনি ওরা ততোই তাঁকে ঘিরে ঘিরে ধরছিলো। ইস, কী নিষ্ঠুরতা!

✵ ✵ ✵

এক সময় তিনি ওদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিতে সক্ষম হলেন আমার কাছে .. আমার মাচানের ছায়ায়। ক্লান্ত অবসন্ন জর্জরিত হত-বিহ্বল দেহটা নিয়ে বসলেন আমার লতানো শাখের নিচে। মজলুম নবী তখন দু'আ করছিলেন এই বলে বলে—

اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي ، اللّٰهُمَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِيْ ؟ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ ؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَه أَمْرِي ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلاَ أُبَالِيْ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِيْ سَخَطُكَ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى .

‘আমার আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমি অসহায়! তাই বলে আমি তো মানুষের কাছে অপমানিত হতে পারি না! তুমি-না দয়ালু! তুমি-না অসহায় দুর্বলের প্রতিপালক! তুমি তো আমারও প্রতিপালক! তবে কাদের হাতে তুমি আমাকে তুলে দিচ্ছো? আমার সাথে দুর্ব্যবহার করবে— এমন লোকের হাতে? নাকি আমার দুশমনের হাতেই তুলে দিয়েছো আমাকে?

আমার কোনো অভিযোগ নেই। তুমি যদি থাকো আমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাহলে কোনো ভয়ও নেই! কোনো পরোয়া নেই আমার! তোমার ক্ষমাই তো আমার সবচে’ বড় পাওয়া! আমি চাই তোমার আশ্রয়ের আলো, যে আলো দূর করে দেবে সকল কালো। দুনিয়া-আখেরাতের সবকিছু তোমার হাতেই তো ন্যস্ত! তোমার অভিশাপ নয়— আমি চাই তোমার সন্তুষ্টি। তোমার ক্রোধ নয়— আমি চাই তোমার কৃপা!’

✱ ✱ ✱

উতবা-শায়বা কাছেই দাঁড়িয়েছিলো। রক্তময় নবীর মর্মস্পর্শী দু‘আ তাদের মর্মেও বুঝি ‘আঘাত’ করলো। উতবা ক্রীতদাস—আদ্দাসকে জোরে ডাক দিলো:

-আদ্দাস! ঐ লোকটাকে এক থোকা আঙুর দিয়ে এসো!

আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না!

কারণ আদ্দাস আমার দিকে এগিয়ে আসছে!

আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না!

কেননা আদ্দাস আমাকে ছিঁড়তে এগিয়ে আসছে!

সত্যি আদ্দাস আমার দিকে আসছে— আমাকে ছিঁড়তে?!

আদ্দাস এখন আমাকে একেবারে মুহাম্মদের সামনে নিয়ে দেবে— আমাকে খেতে?!

আহ! আমার কী সৌভাগ্য!

যাঁর প্রতীক্ষায় অস্থির বেলা কাটাতে কাটাতে আমি ছিলাম মরিয়া দূর থেকে তাঁকে এক ঝলক দেখবো বলে, সেই মুহাম্মদ এখন আমার এতো কাছে?! তাঁর সাথে আমার শুধু এখন দেখাই হবে না, বরং আমি সারা জীবনের জন্যে মিশে যাবো তাঁর পবিত্র রক্তে-মাংসে-অস্থি-মজ্জায়! তাঁর চেতনায়-চিন্তায়! আহা! কী শোকর আদায় করবো তোমার হে আল্লাহ!

আল হামদুলিল্লাহ!!

✸ ✸ ✸

আদ্দাস আমাকে ছিঁড়লো!

একটা তশতরিতে রাখলো!
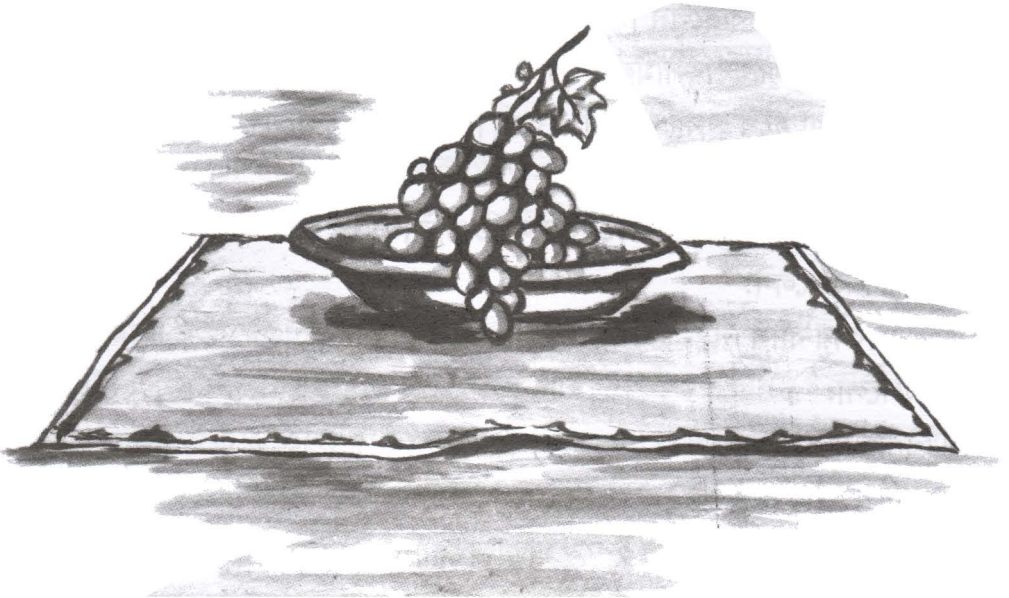
তারপর এক পা দু' পা করে এগিয়ে যেতে লাগলো আদ্দাস!

আদ্দাস এখন মুহাম্মদের কাছে, খুব কাছে!

আমিও মুহাম্মদের নিকটে, খুব নিকটে!

আদ্দাস যতো কাছে যায় আমি ততো নিকটে যাই!

আমি যতো নিকটে যাচ্ছি আমার আনন্দ ও সৌভাগ্য ততো বেশী প্রাণময় .. বাঙ্ময় হচ্ছে! কেমন করে আমি প্রকাশ করবো আমার এ আনন্দ ও সৌভাগ্য!

হে আমার স্বপ্ন!

এখন তুমি কতো রূপময়! তোমার রূপলীলা আমার ছোট্ট জীবনকে কী মহিমাই-না দিয়েছে!

✹ ✹ ✹

এক্ষুণি তাঁর করস্পর্শে আমি ধন্য হবো! এই তো; এইমাত্র আদ্দাস আমাকে এনে রাখলো মুহাম্মদের সামনে! আদ্দাস মুহাম্মদের নূরানি চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। কী ঝলমলে নূর-ছাওয়া চেহারা! অমন চেহারার মানুষ কি আদ্দাস আর দেখেছে? এবার মুহাম্মদকে আদ্দাস খেতে অনুরোধ করলো। মুহাম্মদ অনুরোধ রক্ষা করলেন। বরং আমাকে ধন্য করলেন! 'বিসমিল্লাহ' বলে আমার দিকে হাত বাড়ালেন! খেতে শুরু করলেন। স্পর্শ করলো আমাকে সবচে' বড় সৌভাগ্য!

আদ্দাস মুহাম্মদের মুখে 'বিসমিল্লাহ' শুনে দ্বিতীয়বার অবাক হলো। কারণ এমন কথা কোনোদিন কারো মুখে এখানে বসে ও শুনে নি! তাই তার মনে কৌতূহল সৃষ্টি হলো। ও মুহাম্মদের কাছে জানতে চাইলো:

-এমন কথা তো আমি এখানে কাউকে বলতে শুনি নি!

নবীজী তাকে বললেন:

-তুমি কোথাকার বাসিন্দা?

আদ্দাস বললো:

-আমি নিনাওয়া'র মানুষ!

রাসূল জবাবে বললেন:

-তুমি দেখছি পুণ্যপুরুষ ইউনুস ইবনে মাত্তা'র দেশের মানুষ!

-ইউনুস ইবনে মাত্তাকে আপনি চেনেন!!

আদ্দাসের চোখে রাজ্যের বিস্ময়!
আল্লাহ্‌র রাসূল জবাব দিলেনঃ
হ্যাঁ, চিনি! তিনি যে আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন, আমিও নবী!

❋ ❋ ❋

এরপর আদ্দাস আর স্থির থাকতে পারলো না!
একটু আগের আদ্দাস বদলে গেলো!
শুধু আঙুর সঁপে দিতে-আসা আদ্দাস এখন নিজেকেই সঁপে দিলো!
ভালোবাসা-শূন্য আদ্দাস এখন ভালোবাসায় আপ্লুত, পরিপ্লুত হয়ে গেলো!
ও সামনে ঝুঁকে নবীজীর মাথায়-হাতে-পায়ে চুমু খেতে লাগলো!
আর বলতে লাগলো— 'অবশ্যই, অবশ্যই আপনি নবী! নবীরা ছাড়া আর কেউ তো সত্যের পথে জুলুম নির্যাতন সইতে পারে না!'

❋ ❋ ❋

ধন্য আমি, চিরধন্য!
হ্যাঁ .. নবীজী আমাকে আরাম করে খাচ্ছেন!
সুখ সুখ চেহারা নিয়ে খাচ্ছেন! আমি যেনো তাঁর অনে-ক প্রতীক্ষিত খাবার! এ বাগিচায় যেনো তিনি শুধু আমার জন্যেই এসেছেন! আহা! আমাকে তিনি যখন হাত দিয়ে স্পর্শ করে মুখে তুলছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেনো রাজফল! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফল! ইতিহাসের সেরা আঙুরের থোকা! অবশ্যই সেরা! আমি হতে পেরেছি নবীজীর খাদ্য!! এমন সময়ে, যখন তিনি ক্লান্ত অবসন্ন জুলুম জর্জরিত রক্ত-রঞ্জিত!!
এ ছাড়া আমার আরেকটা সৌভাগ্য হলো, আমি দু'চোখভরে দেখেছি— কেমন করে পাথরবৃষ্টির পর আসে চুমুবৃষ্টি! আরো দেখেছি সত্যের সন্ধান পেয়ে কেমন করে আদ্দাস সে সত্যকে আকড়ে ধরেছিলো! উতবা শায়বার চোখের সামনে! তাদের লাল চোখের রাঙানিকে নিঃশঙ্কে উপেক্ষা করে! সত্যের খোঁজে-থাকা মানুষ সত্যকে এভাবেই আলিঙ্গন করে!
ধন্য (আমার মতো) তুমিও হে আদ্দাস!

আমি ‘জামাল’ বলছি

হ্যাঁ, আমি জামাল, মানে উট। কিন্তু বাস্তব উট নই, বাস্তব উটের ছায়া। ছায়া-উট। দৃশ্যে এসেছিলাম, আবার অদৃশ্যে মিলিয়ে গেছি। আমার এই আসা-যাওয়ার মাঝে চমৎকার একটা কাহিনী আছে। এ-কাহিনীই এখন তোমাদের শোনাবো। শুনলে বুঝতে পারবে, আমাদের নবীজীর শান (মর্যাদা) কতো! তাঁর জামাল (সৌন্দর্য) কতো! তাঁর মানবতা কতো! তাঁর দয়ামায়া কতো! ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীনতা কতো!

আমি তো ছায়া-উট। কায়া-উট মানে সত্যিকারের উটও তাঁকে —মুহাম্মদকে— নিয়ে অনেক কাহিনী বলেছে। ছোট্ট বেলায় রাসূল যেমন মেষ চরিয়েছেন তেমনি উটও চরিয়েছেন। কায়া-উটেরা আমাকে বলেছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ওদের সাথে ভীষণ কোমল আচরণ করতেন। মায়ার আচরণ করতেন। দয়ার আচরণ করতেন। উট ও মেষ ফেলে রেখে কখনো তিনি অন্য রাখালদের মতো খেলতে চলে যেতেন না, বরং সারাক্ষণ ওদের কাছে কাছে থাকতেন। ওদের দেখভাল করতেন। মরুকষ্ট থেকে ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। উটের কষ্ট যেনো তাঁরই কষ্ট! মেষের কষ্ট যেনো তাঁরই কষ্ট! যে-কোনো প্রাণী’র কষ্ট যেনো তাঁরই প্রাণের কষ্ট! এমন তো হবেই! তিনি-যে সারা পৃথিবীর রহমত! মানুষের জন্যে রহমত! প্রাণী’র জন্যে রহমত! সবার জন্যে রহমত! সবকিছুর জন্যে রহমত!!

✹ ✹ ✹

আল-আমীন উটের উপর সওয়ারও হয়েছেন অনেক। সওয়ারী হিসাবে তিনি ছিলেন ভীষণ দয়ালু ও কোমল। উটের প্রতি ভীষণ লক্ষ্য রাখতেন তিনি। কোনো কষ্ট তো

হচ্ছে না! বোঝাটা ভার হয়ে যায় নি তো! উটের পিঠে করে তিনি সফর করেছেন সিরিয়া ও ইয়েমেন। কখনো চাচা আবু তালিবের সঙ্গে, কখনো খাদিজার ব্যবসা নিয়ে। সে সব সফরে উটেরা তাঁকে গভীর করে চিনেছে। কাছ থেকে জেনেছে। মক্কায় কিংবা মদীনায়, সান'আয় কিংবা দামেস্কে উটেরা দেখেছে তাঁর ক্রয়-বিক্রয়। আর দেখেছে তাঁর নজিরবিহীন আমানতদারী ও সততা। আরো দেখেছে অল্প সময়েই তাঁর প্রতি মানুষের ঝুঁকে পড়ার বিরল মধুর দৃশ্য। জাহেলী যুগে কোরাইশ ব্যবসায়ীরা যেখানে কথায় কথায় মূর্তির নামে শপথ করছে, আল-আমীন সেখানে একটি বারের জন্যেও মূর্তির নামে শপথ করেন নি। অথচ লোকজনের ভীড় তাঁর কাছেই বেশী। তাঁর বেচা-কেনাই সবচে' বেশী। লাভবানও সবচে' তিনিই বেশী। তাঁর কাছ থেকে মানুষ পণ্য কিনে নিয়ে যায় উট বোঝাই করে আর বিস্ময় ও মুগ্ধতা নিয়ে যায় মন বোঝাই করে।

এবার একটি কাহিনী শোনো—আমার নিজের কাহিনী, যা অন্য উটের কাহিনীর সাথে একদম মিলবে না। একেবারেই আলাদা। ভীষণ মজাদার। নাওয়া-খাওয়া ভুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো। শুরু হোক তাহলে—

একদিন ভিনদেশী এক বণিক এলেন মক্কায়। সঙ্গে কিছু উট। উদ্দেশ্য হলো, তিনি এ- গুলো মক্কার বাজারে বিক্রি করবেন। তারপর অল্প-বিস্তর যা লাভ হয়, তা-ই নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন। ঘটনাক্রমে এ-গুলো কিনলো আবুল হাকাম, আবু জেহেল নামেই যার বেশী 'খ্যাতি'। কিনলো তো বলেছি, কিন্তু আসলে সে কিনে নি। জাহেলী যুগে অনেক খারাপ খারাপ অভ্যাস ছিলো মানুষের। এর মধ্যে একটা হলো, পণ্য কিনে মূল্য মারা—পরিশোধ না করা। আবু জেহেলও তাই করলো। উট নিয়ে চলে গেলো আর মূল্যটা মেরে দেওয়ার ফন্দি আঁটলো। এদিকে উট বিক্রেতা আবু জেহেলকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। এতোগুলো উট, মূল্যটা তো নেহাত কম নয়। কিন্তু আবু জেহেলকে ধরেও ধরা যাচ্ছে না। যে-ই আবু জেহেল বুঝতে পারে ব্যবসায়ী তাকে অনুসরণ করছেন সঙ্গে সঙ্গে সে কেটে পড়ে—উধাও হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে; যে কোনো মূল্যে আবু জেহেল মূল্যটা না দেওয়ার ফন্দি আঁটছে। আঁটবেই তো! আবু জেহেল যে একটা ফন্দিবাজ। আস্ত একটা ধড়িবাজ। নইলে ভিনদেশী সওদাগরের পণ্য কিনে মূল্য নিয়ে কেনো এই ফন্দি'বাজি' .. ধড়িবাজি?!

এ দিকে বেচারা উট বিক্রেতার মাথায় হাত। এতোগুলো উটের মূল্য না পেলে তার ব্যবসাই-যে লাটে ওঠবে! অনেক চেষ্টা করেও যখন আবু জেহেলের 'নৈকট্য' লাভ হলো না তখন অনন্যোপায় হয়ে এমন কারো হাত ধরার চিন্তা করলেন যিনি আবু জেহেলের কবল থেকে মূল্যটা 'উদ্ধার' করে দেবেন। ব্যবসায়ীটি হতাশ মনে 'সেই মানুষটি'কেই খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো, অদূরেই। ব্যবসায়ী ভাবলেন— আচ্ছা, এদের কাছে কি সাহায্য চাওয়া যায়?.. চেহারা সূরত দেখে মনে হচ্ছে এরা বেশ প্রভাবশালী। তাই হলো। ব্যবসায়ী তাদের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনাটা বলে প্রতিকার চাইলেন। সহযোগিতা চাইলেন।

কিন্তু লোক চিনতে ভুল হয়ে গেলো। ওরা ছিলো আসলে আবু জেহেলের চেলা। কট্টর কাফের। ভিতরটা অন্ধকারে ঠাসা। তাই ভালো কিছু আশা করা বৃথা। তার নমুনা দেখো—

ব্যবসায়ীটি যখন ওদের কাছে সাহায্য চাইছিলেন ঠিক তখনই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন ইসলামের গোপন দাওয়াতকাল চলছিলো। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হয়েছেন তিন বছরও হয় নি এবং তিনিসহ সাহাবীদের উপর চলছিলো সীমাহীন জুলুম নির্যাতন। তখন ঐ লোক দু'জনের একজনের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেলো। সে আল্লাহ্‌র রাসূলকে অপদস্থ করতে চাইলো। তাঁকে নিয়ে একটা 'খেলা' খেলতে চাইলো। সে ভাবলো, লোকটা আমার কাছে আবু জেহেলের বিরুদ্ধে সহযোগিতা চাইতে এসেছে। এখন আমি যদি একে মুহাম্মদের কথা বলে দিই এবং তাঁর কাছেই সহযোগিতা চাইতে বলি, তাহলে ভালো একটা মজা হবে। মুহাম্মদ লোকটাকে সহযোগিতা করতে নিশ্চিত আবু জেহেলের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবে। গেলেই তো আর আবু জেহেল তার কথায় উটের মূল্য পরিশোধ করে দেবেন না, বরং মুহাম্মদকে একটা আচ্ছামতো অপমান করে ছাড়বেন। সেটা কঠিন গালিগালাজও হতে পারে আবার প্রহার-টহারও হতে পারে। এই দুষ্টচিন্তা থেকেই সে বললোঃ

-তুমি একটা কাজ করো। ঐ-যে লোকটি যাচ্ছে, তার কাছে যাও। গিয়ে তোমার

সমস্যাটা খুলে বলো। আমার বিশ্বাস, সে তোমার কাজটা করে দিতে পারবে।
এ দিকে কাফের-সঙ্গীটিও এ দুষ্টচিন্তায় শরীক হয়ে বললো:
-হ্যাঁ, তুমি জলদি গিয়ে তাকে ধরো। তোমার কাজ হবেই হবে। আবু জেহেল তাকে খুব মানেন কি না—তার কথায় ওঠেন আর বসেন! সে সুপারিশ করলে আবু জেহেল ফেলতে পারবেন না! সুতরাং তাড়াতাড়ি যাও। তাকে গিয়ে বলো। দেখবে কেমন যাদুর মতো তোমার কাজ করে দেবে মুহূর্তের ভিতর!

❋ ❋ ❋

ব্যবসায়ী ওদের কথায় প্রভাবিত হলেন। ব্যবসায়ী ওদের কথায় আশা পেলেন। তাই জলদি গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন:
-জনাব! আমি এক ভিনদেশী বণিক। কিছু উট বিক্রি করেছিলাম আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জেহেল) এর কাছে। কিন্তু তিনি মূল্য পরিশোধ করেন নি এবং করবেন বলেও মনে হচ্ছে না। আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন? আমার মূল্যটা কি একটু উসুল করে দেবেন?! নইলে আমি বড়ো বিপদে পড়ে যাবো!

আল্লাহ্র রাসূল লোকটির বিপদ বুঝলেন। তার অসহায়ত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি ঠিক বন্ধুর মতো লোকটির হাত আপন মুঠোয় নিলেন। তারপর তাকে নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে নিজেদের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে দেখে ঐ দুষ্ট লোক দু'টির মুখে ছড়িয়ে পড়লো কূটিল হাসি। ওরাও দূরত্ব বজায় রেখে তাদেরকে অনুসরণ করলো এবং আবু জেহেলের বাড়ির একটু দূরে এসে থামলো, যেখান থেকে সব স্পষ্ট দেখা যায়। ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো, একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখার জন্যে। ওরা কল্পনা করতে লাগলো, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আবুল হাকামের ফুঁসে ওঠার দৃশ্যটা না জানি আজ কী ভয়ঙ্কর হয়! ভয়ঙ্কর তো হবেই! মুহাম্মদ যেচে এসেছে লোকটাকে সহযোগিতা করতে, উটের দাম উসুল করে দিতে, বাহাদুরী ফলাতে! এখন দেখা যাবে— কতো উটে কতো মূল্য! আবুল হাকাম মূল্য দেবেন না, দেবেনই না। আর মুহাম্মদ মূল্য আদায় করে দেবে, চেষ্টা করবেই। জব্বর মজা হবে! হা .. হা .. !! আমাদের পাতা জালে আজ মুহাম্মদ ভালো মতনই আটকা পড়েছে! কোরাইশ গোত্র দেখবে আজ আরেকটা নতুন

যুদ্ধ! আবুল হাকাম আর মুহাম্মদ! মুহাম্মদ আর আবুল হাকাম! কোরাইশ গোত্র আজ একটা আনন্দের খোরাক পাবে। হা .. হা .. হা!!

✵ ✵ ✵

ঐ দুষ্ট লোক দু'টি এ-সব বলাবলি করতে করতে হাসছিলো আর একে অপরের গায়ে গিয়ে পড়ছিলো। ওরা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে দেখে খুশিতে একে অপরকে অভিনন্দনও জানাচ্ছিলো। আল্লাহ্র রাসূল লোকটিকে নিয়ে যখন আবু জেহেলের দরোজার কড়া নাড়লেন তখন ওরা বড় বড় চোখে সে দিকে তাকিয়ে রইলো। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো তাদের পরিকল্পিত সেই কাঙ্ক্ষিত লড়াইয়ের।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরোজায় খটখট আওয়াজ দিয়ে আবু জেহেলকে ডেকে উঠলেন। ভিতর থেকে তখন ভেসে এলো আবু জেহেলের অহঙ্কারী কণ্ঠ:

-দরোজায় কে?!

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন:

-আমি মুহাম্মদ, একটু বাইরে আসতে হবে!

আবু জেহেল দরোজা খুললো। বেরিয়ে এলো। মুহাম্মদকে একটা 'আচ্ছা মজা' দেখানোর চিন্তা নিয়েই সে বের হয়ে এলো। কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়ানোর আগেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত ও নির্ভিক কণ্ঠে বললেন:

-এই ব্যবসায়ীর মূল্যটা দিয়ে দাও!

✺ ✺ ✺

তারপর কী হলো?

তারপর কী ঘটলো?

আবু জেহেল কি ঝলসে উঠলো?

আবু জেহেল কি নবীজীর উপর হামলে পড়লো?

না! আবু জেহেল ঝলসে ওঠে নি!

হামলেও পড়ে নি!

আবু জেহেল কি ফুঁসে উঠেছিলো?

না, তাও পারে নি!

আবু জেহেল তাহলে কী করলো?

আবু জেহেল যা করলো তা অকল্পনীয়, অভাবনীয়!

আল্লাহ্‌র রাসূলের দিকে তাকাতেই আবু জেহেলের চেহারাটা কাচুমাচু হয়ে গেলো! বরং তার উদ্ধত দৃষ্টি জম-দেখা মানুষের মতো জ্যোতিহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। শুধু তাই না; রাজ্যের ভয়-কাতরতা সেখানে কিলবিল করতে লাগলো। তারপর?

ওই তো, সাক্ষাত জম-দেখা মানুষের মতো থরথর করে আবু জেহেল কাঁপতে লাগলো!

তারপর?

তারপর মাথাটা দুলিয়ে মূল্য পরিশোধের 'সম্মতি জানিয়ে' পলাতক গোলামের মতো ভিতরে চলে গেলো!!

✺ ✺ ✺

ভিনদেশী বণিকটির বিস্ময়ের কোনো সীমা রইলো না! আরো বেশী বিস্মিত হলো অদূরে দাঁড়িয়ে-থাকা ঐ দুষ্ট লোক দু'টি, যারা একটা মজা দেখার অধীর অপেক্ষায় প্রহর গোনছিলো, মুহাম্মদের উপর আবু জেহেলের হামলে পড়ার মজা। কিন্তু তারা হতাশ হলো না। ভাবতে লাগলো, আবুল হাকাম আসলে এখন ভিতরে গিয়েছেন কোনো 'ডাণ্ডা' আনতে। এলেই শুরু হবে ডাণ্ডাবৃষ্টি! এই বুঝি বেরিয়ে আসছেন! কিংবা নিয়ে আসতে গেছেন আগুনে স্যাঁকা কোনো লোহার শিক। এনেই মুহাম্মদের কপালটায় এঁকে দেবেন একটা উষ্ণ স্যাঁকা-চিহ্ন! তাই যেনো হয়! এটাই মুহাম্মদের পাওনা! সাহস কতো! আবুল হাকামের ইচ্ছের বিরুদ্ধে লড়তে আসা! সুতরাং হতাশার কিছু নেই। একটু সবর করো। এই বুঝি 'উদয় হলেন' আবুল হাকাম রুদ্রমূর্তিতে, রণ-দাপটে!

✵ ✵ ✵

একটু পর আবু জেহেল এলো!
দ্রুতই এলো!
সাথে একটা জিনিসও নিয়ে এলো!
কিন্তু সেটা ডাণ্ডা কিংবা লোহার শিক নয়—
উটের মূল্য! একেবারে পুরোটা!
'পাইয়ে-পাইয়ে .. আনায় আনায়'!!
অদূরে দাঁড়িয়ে-থাকা লোক দু'টি যেনো 'আকাশ হইতে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল'!

একটু আগের 'বেচারা ব্যবসায়ী'র বিস্ময়ের ঘোর কাটতে-না-কাটতেই তাতে এসে যোগ হলো আনন্দ, মহা আনন্দ। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না! যে লোকটা তাকে এতো কষ্ট দিলো, এমন কি মূল্যটা না দেওয়ার জন্যে দিনের পর দিন অদ্ভুত টালবাহানা করলো, সে আজ কেমন করে অমন বাধ্য ভৃত্যের মতো সমস্ত পাওনা তার হাতে এনে রেখে দিলো— এতো সহজে এবং এতো বিস্ময়কর দ্রুততায়?!

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়-বিমুগ্ধ ব্যবসায়ীকে বললেন:

-আপনার উটের মূল্য সব বুঝে পেলেন!

আনন্দ গদগদ কণ্ঠে ব্যবসায়ী বললেন:

-জ্বী অবশ্যই!!

এরপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাজে চলে গেলেন, বিস্মিত ব্যবসায়ীটি তাঁকে মুখের ভাষায় একটু ধন্যবাদ জানানোরও সুযোগ পেলেন না। শুধু চোখের ভাষায় বললেন যেনো—

কে তুমি হে মহান?

অমন ভালো মানুষের দেখা তো আমি জীবনে আর পাই নি!

আমি কি তোমাকে আবার পাবো?

তোমার সাথে মন খুলে একটু কথা বলতে পারবো?

তোমার উন্নত চরিত্রের দ্যুতিতে একটু দ্যুতিত হতে পারবো?

কে তুমি হে সুন্দর?!
তোমাকে তো ভালো করে একটু কৃতজ্ঞতাও জানানো হয় নি!

✷ ✷ ✷

আল্লাহ্‌র রাসূল চলে যেতেই ব্যবসায়ীর কাছে দৌড়ে-প্রায় ছুটে এলো লোক দু'টি! তারাও বিস্মিত! চোখের সামনে যা ঘটে গেলো তাকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না!
সত্যিই কি তা ঘটেছে যা তারা দেখেছে!
কিন্তু ঐ চান্দুদের বিশ্বাস না করে উপায় কী? ব্যবসায়ী নিজে গোনে গোনে তাদেরকে দেখালেন যে, আবুল হাকাম 'কড়ায় গণ্ডায়' তার পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে! তারপর ব্যবসায়ী তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন:
-ঐ মহান লোকটিকে অনেক ধন্যবাদ! আমি কল্পনাও করি নি, এতো সহজে এবং এমন বিস্ময়কর দ্রুততায় তিনি আমার পাওনাটা উসুল করে দেবেন! আর তোমাদেরকেও ধন্যবাদ! তোমরাই তো আমাকে তাঁর কাছে যেতে বলেছো!!
ওরা ব্যবসায়ীর দিকে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

✷ ✷ ✷

একটু পর ভেবাচ্যাকা-খাওয়া লোকগুলি ছুটে গেলো কোরাইশের কাছে! ওদেরকে গিয়ে জানালো চোখে-দেখা 'আবুল-হাকাম-কাহিনী'! একেবারে দাঁড়ি-কমাসহ। সবার চোখে বিস্ময়! তাহলে কি আবুল হাকাম কাপুরুষ হয়ে গেলেন! মুহাম্মদের কাছে এতোটা নতজানু হওয়ার অর্থ কী!
সবাই উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেলো! বললো, চলো, আবুল হাকামের বাড়ি চলো!

✷ ✷ ✷

আসল ব্যাপার জানতে সবাই রোষ-কষায়িত হয়ে ছুটে গেলো 'আবুলহাকামখানায়'। গিয়েই দরোজায় জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলো। আর বলাবলি করতে লাগলো, এর মানে কী! মুহাম্মদ ব্যবসায়ীর মূল্য দিয়ে দিতে বললো আর অমনি তিনি দিয়ে দিলেন! এ তো দেখছি মুহাম্মদের প্রতি রীতিমত আনুগত্য প্রকাশ! তবে কি ভাতিজার কাছে কাবু হয়ে গেলেন চাচাজান?!
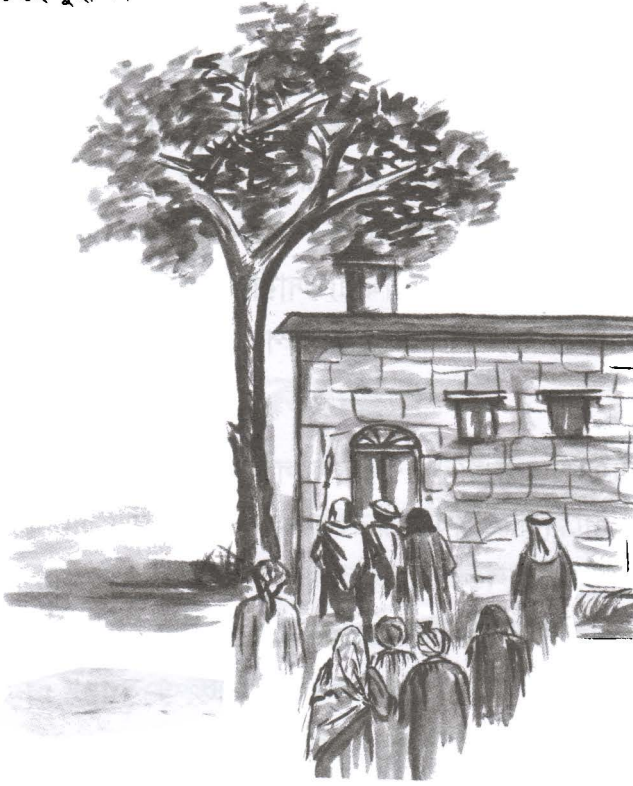
কিন্তু কী আশ্চর্য! এতো ধাক্কাধাক্কি তবু দরোজা খোলা হচ্ছে না কেনো? ভিতরে কেউ নেই নাকি? আশ্চর্য! এমন তো আগে কখনো হয় নি!

উপস্থিত কোরাইশ নেতৃবর্গ হৈচৈ শুরু করে দিলো। অবশেষে অ-নে-ক কষ্টে দরোজাটা খোলানো গেলো তখনই, যখন আবুল হাকামের বিশ্বাস হলো, মুহাম্মদ নয়— দরোজায় দাঁড়িয়ে কোরাইশেরই লোকজন! এরপর আবুল হাকাম তাদের ক্রুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে কাঁপাকাঁপা আওয়াজে বলতে লাগলো:

-তোমরা আমাকে ভুল বোঝো না। আসলে আমি দরোজাটা খুলেছিলাম মুহাম্মদকে ধোলাই দিতেই। ওর সাহস কতো! ঐ লোকটার পক্ষ নিয়ে আমার সাথে লড়তে এসেছে! কিন্তু কী আর বলবো তোমাদেরকে, মুহাম্মদের দিকে 'আগুনঝরা' দৃষ্টি নিয়ে তাকাতেই দেখলাম, ঠিক মুহাম্মদের মাথার উপর দিয়ে ইয়া বড় একটা উট আমার দিকে হা করে আছে দাঁত খিঁচিয়ে! যেনো এক্ষুণি আমায় গিলে খাবে, যদি না-দিই ব্যবসায়ীর পাওনা! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে কলিজা আমার শুকিয়ে গেলো! থরোথরো পায়ে ভিতরে গেলাম! মনে হচ্ছিলো সেই হা-করা উটটাও আমার পেছনে

পেছনে আসছে! আমি ভয়ে পেছনে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছিলাম না! সত্যি সত্যি এসে থাকলে! আমার আরো মনে হচ্ছিলো, যদি আমি ব্যবসায়ীর পাওনা নিয়ে অবিলম্বে দরোজায় হাজির না হই, ঐ ভয়ঙ্কর উটটা আমাকে চিরতরে শেষ করে দেবে! তাই আমি আর দেরী করলাম না। তড়িঘড়ি করে থলে নিয়ে হাজির হলাম দরোজায়, পাওনাটা নিয়ে তুলে দিলাম ব্যবসায়ীর হাতে, মুহাম্মদের সামনে! তারপর দ্রুত দরোজাটা লাগিয়ে দিয়ে ভিতরে এসে হাঁপাতে লাগলাম! হাঁপাতেই থাকলাম!

✷ ✷ ✷

আবু জেহেলের এই কাহিনী শুনে একজন বলে উঠলো:

-হুঁ, বুঝেছি এখন, দরোজা না খোলার রহস্যখানা! আশ্চর্য! এ সব কী শুনছি!

আরেকজন টিপ্পনি কেটে বললো:

-আবুল হাকাম নিশ্চয়ই এও ভেবেছিলেন যে, মুহাম্মদের মাথার উপর দিয়ে ঐ উটটাও দাঁত খিঁচিয়ে তাকিয়ে আছে, আশ্চর্য! কী হচ্ছে এ-সব?!

এ-কথা শুনে কয়েকজন হেসে উঠলো—বিদ্রূপের হাসি!

✷ ✷ ✷

আল্লাহ্‌র কী লীলা! মুহাম্মদকে নিয়ে যে-হাসিটা দেখার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলো ঐ দুষ্টরা সে-হাসিটাই এখন ওরা দেখলো আবু জেহেলকে নিয়ে!

এবার ওরাও বিদ্রূপে সবার সাথে যোগ দিয়ে বললো:

-অসম্ভব! আমরা এ-কথা বিশ্বাস করি না! আমরাও তো অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম! কই, কোনো উট তো আমাদের চোখে পড়ে নি!

এদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বাকীরা বললো:

-বুঝেছি, সব বুঝেছি! আসলে মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বই আবুল হাকামের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে! সম্ভবত যতোবার মুহাম্মদ আসবে ততোবারই আবুল হাকামের এই অবস্থা হবে!

এই বলে কোরাইশ এক যোগে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলো—হা হা হা.......!

আমি বোরাক বলছি

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন না ছিলো আধুনিক রকেট কিংবা এইসব কৃত্রিম উপগ্রহ। এ-সব আবিস্কার হওয়ার হাজার হাজার বছর আগে থেকেই আমি ছিলাম। আমি বোরাক। মানুষ কতো নামে আমাকে ডাকে। কেউ বলে আসমানী বাহন। কেউ বলে বিদ্যুৎ বাহন। আমি দেখতে কেমন? এ ব্যাপারেও নানা জনের নানান মত। আমি বলি কি; আমি হলাম এক বিশেষ বাহন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমার স্রষ্টা। বাস্.. এ-ই আমার সবচে' বড় পরিচয়। নবীরা সওয়ার হয়েছেন আমার পিঠে— এও আমার এক গর্বের ইতিহাস। কিন্তু সব নবীর সেরা নবী যিনি তিনি শুধু আমার পিঠে সওয়ার হয়েছেন— তাই নয় বরং তাঁর সাথে জড়িয়ে আছে আমার অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা। বরং বলা উচিত— এক বিস্ময়কর মু'জিযা। এখন বলতে চাই তোমাদেরকে সেই ঘটনা, যা হার মানায় গল্পকেও! এমন কি কল্পনাকেও!

বার বছর ধরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে অনেক জুলুম-অত্যাচার সইতে হয়েছে। নবীজীর জীবনে এসেছে অনেক কষ্ট। অনেক দুঃখ। অনেক শোক। এর মাঝেই তিনি হারিয়েছেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে। হারিয়েছেন প্রিয় চাচা আবু তালিবকে। কাফির মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারের মাত্রাটাও এর ফলে অনেক বেড়ে গেছে। ঈমান ও জীবন বাঁচাতে অনেক সাহাবীকেই হাবশায় হিজরত করতে হয়েছে।

মক্কায় দাওয়াতের কাজ কঠিন হয়ে গেলো, অনেক কঠিন। হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি তায়েফে। আশা নিয়ে, অনেক আশা। বুকভরা আশা। কিন্তু ওরা—তায়েফের লোকেরা তাঁকে দিলো শুধুই হতাশা। বুকভরা ব্যথা। রক্তঝরা দুঃখ। অশ্রুঝরা প্রত্যাবর্তন।

তায়েফ থেকে ফেরার পরই প্রিয় রাসূলকে ডেকে পাঠালেন আল্লাহ্ একেবারে নিজের সকাশে! সঙ্গে থাকবেন কে? যাওয়ার বাহনটাই-বা কী হবে? সঙ্গে থাকবেন আসমানী দূত— জিবরীল। আর বাহন হলাম আমি—বোরাক!

আরো বিস্তারিত বলি—

সময়টা ছিলো রজবের ২৭ তারিখ রাত। রাতে জিবরীল গেলেন নবীজীকে জাগাতে। তিনি সেদিন ঘুমিয়ে ছিলেন আবু তালিব তনয়া—উম্মে হানীর গৃহে, কা'বার একেবারে পাশে। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে এলেন কা'বা চত্বরে, যেখানে আমি অপেক্ষা করছিলাম। সেখানে তিনি তাঁর ক্বলবটাকে ধুইয়ে দিলেন জমজম দিয়ে। সাথে সাথে তা ভরে গেলো ঈমানের নূরে। হিকমতের (শরীয়তের গভীর জ্ঞানের) নূরে। এরপর আল্লাহ্র রাসূল আমার উপরে সওয়ার হলেন। গভীর রজনীর নিঝুম প্রহরে শুরু হলো ইসরা—বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে পথচলা। সঙ্গে আছেন হযরত জিবরীল। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ক্ষীপ্র গতিতে।
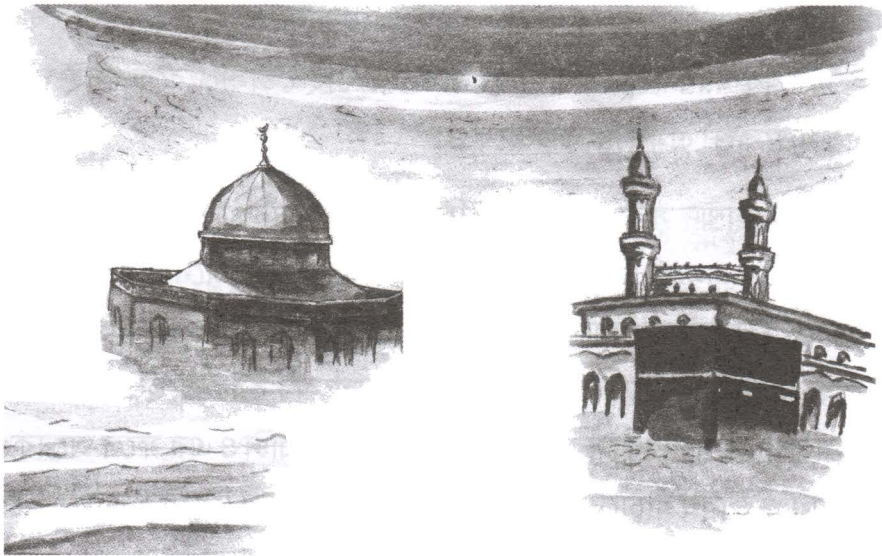
মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই পথে পড়লো এক বণিক দল। এরা ছিলো কোরাইশ গোত্রের। এদের একটা উট হারিয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দিলেন, কোথায় গেলে পাবে উটের সন্ধান। একটু পর আরেকটি বণিক কাফেলা আমাদের পথে পড়লো। ওদের বেশকিছু উট দলছুট হয়ে কোথায় যেনো চলে গিয়েছিলো। একটার পা ভেঙে গিয়েছিলো। কিছুক্ষণ পর আরেকটা কাফেলার দেখা পেলাম। ঐ কাফেলার আগে আগে চলছিলো একটা উট যার উপরে চাপানো ছিলো দু'টি কালো বোঝা।

যেতে যেতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো দেখেছেন অনেক কিছু। তখন তাঁর মনে জেগেছে কতো কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে সে কৌতূহল প্রকাশও করেছেন তিনি। হযরত জিবরীলও মিটিয়েছেন তাঁর কৌতূহল।
নবীজী দেখলেন এক যুবতীকে। যেমন তার যৌবনময় রূপ তেমনি তার রূপময় পোশাক। ঐ যুবতীটি গলা ফাটিয়ে ডাকছিলো নবীজীকে। বলছিলো, মুহাম্মদ, এই মুহাম্মদ! কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল তার ডাকে সাড়া দিলেন না। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না।
হযরত জিবরীল তাঁকে জানালেন:
-আপনাকে একটু আগে যে যুবতীটি ডাকছিলো, জানেন, ও কে? ও হলো দুনিয়া, রূপ ধরে এসেছিলো আপনাকে আকর্ষণ করতে।
আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন:
-আমার কোনো প্রয়োজন নেই এই দুনিয়ার!
আমরা 'ইয়াসরিব' (মদীনায়) পৌঁছার পর জিবরীল বললেন:
-এই-যে ইয়াসরিব। এখানে আপনাকে হিজরত করতে হবে। তখন জায়গাটার নাম রাখবেন— মদীনা মুনাওয়ারা। এখানেই আপনার ইন্তেকাল হবে।

এরপর আমরা অতিক্রম করলাম এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যারা ফসল রোপন করছিলো আর কাটছিলো। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য! ফসল কাটতে-না-কাটতেই আবার আগের মতো ফলে যাচ্ছে, যেনো আগে কাটাই হয় নি! শীষগুলো

শস্যদানায় দুলছে! আবার যেই-না কাটা অমনি আবার আগের মতো— যেই সেই!!
নবীজী জিবরীলকে বললেন:
-ভাই, এ কী!
জিবরীল বললেন:
-এরা হলেন আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ! এদের সৎ কাজের বিনিময় আল্লাহ সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন।
আমরা আরো দেখেছি, সালাত তরককারীদের সাজা। যাকাত অনাদায়ের শাস্তি।

যেতে যেতে হঠাৎ মনে হলো, মিষ্টি একটা বাতাস বইছে। ঘ্রাণে ঘ্রাণে চারদিক মৌ মৌ করছে। ঠিক তখনই কানে ভেসে এলো মধুময় একটা কণ্ঠ।
আল্লাহ্‌র রাসূল জানতে চাইলেন:
-এটা কী কণ্ঠ? কোত্থেকে আসছে এই ঘ্রাণ?
জিবরীল বললেন:
-এটা জান্নাতের কণ্ঠ! জান্নাত বলছে, আমাকে যা যা দেয়ার কথা ছিলো স-ব দিয়ে দাও! আমার আয়োজন কতো! এই-যে আমার কক্ষ! এই-যে আমার রেশমী বস্ত্র! সোনা-দানার কোনো অভাব নেই! আর পান পাত্র? সোরাহি? মধুর নহর? দুধের নহর? স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণ? অনে-ক .. অফুরান! বে-হিসাব!!

আরেকটা উপত্যকা অতিক্রমকালে ভেসে এলো একটা অসহনীয় দুর্গন্ধ। আর শোনা গেলো একটা জঘন্য কণ্ঠ।
আল্লাহ্‌র নবী জানতে চাইলেন:
-এ আবার কী!
জিবরীল জানালেন:
-এ হলো জাহান্নাম। ডেকে ডেকে বলছে, আমাকে যা যা দেয়ার কথা ছিলো সব দাও! আমার আয়োজন কতো! এই-যে আমার শিকল ও বেড়ি। আর আমার ভিতরের অগ্নিতাপ? ভীষণ! মারাত্মক! কখন পাবো আমি আমার প্রতিশ্রুত জিনিস? আর তো তর সইছে না!

✵ ✵ ✵

চোখের পলকেই আমরা বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে গেলাম। মুহাম্মদ আমাকে উঁচু একটা পাথর খণ্ডের সাথে বাঁধলেন। সেই পাথরখণ্ডটা আজো আছে। মুসলিম উম্মাহ পাথরখণ্ডটির উপর একটি সুসজ্জিত ও কারুকার্যময় গম্বুজ নির্মাণ করেছে, যা 'কুব্বাতুস সাখরা' নামে খ্যাত—পরিচিত। মুহাম্মদ আমাকে রেখে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিলেন স-ব নবী রাসূল। সবার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। সবাইকে নিয়ে তিনি নামাজ পড়লেন। ইমাম হলেন তিনি আর সবাই হলেন মুক্তাদি। নামাজ শেষে শুরু হলো মি'রাজ—মূল অভিযান। জিবরীল একটা সিঁড়ি নিয়ে এলেন। এই সিঁড়িটা উঠে গেছে সোজা মহাকাশের দিকে। এই সিঁড়ি দিয়ে এখন নবীজীর যাত্রা হবে আকাশের দিকে। আরশের দিকে। সিঁড়ির নামেই এ-অভিযানের নামকরণ হয়েছে মি'রাজ। যার মানে— সোপান যোগে ঊর্দ্ধ গমন অর্থাৎ আল্লাহর সকাশে উপস্থিতি।

চলতে চলতে আল্লাহ্র রাসূল পৌঁছে গেলেন প্রথম আকাশে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানালেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। এরপর এলো দ্বিতীয় আকাশ। সেখানে তাঁর দেখা হলো ঈসা আলাইহিস সালাম, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম ও যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে। এরপর এলো তৃতীয় আকাশ। সেখানে ছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। এরপর চতুর্থ আকাশ। সেখানে ছিলেন হযরত ইদরিস আলাইহিস সালাম। এরপর এলো পঞ্চম আকাশ। সেখানে দেখা হলো হযরত হারুন আলাইহিস সালাম-এর সাথে। ষষ্ঠ আকাশে তাঁকে স্বাগত জানালেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। এরপর এসে গেলো সপ্তম আকাশ। সেখানে সাক্ষাত হলো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে। সবাই নবীজীকে স্বাগত জানালেন এই বলে— مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح (সুস্বাগতম পুণ্যবান নবীকে, পুণ্যবান ভাইকে!)।

এরপর আল্লাহ মুহাম্মদকে সিদরাতুল মুনতাহায় উন্নীত করলেন! তারপর হাজির হলেন তিনি আল্লাহ্র মহা সান্নিধ্যে!
সেখানে তিনি ভক্তিভরে তাঁকে সেজদা করলেন!

তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন!
তাঁর স্তুতি গাইলেন!
তাঁর নিবেদনে ঢেলে দিলেন অযুত নিযুত কৃতজ্ঞতা!
কৃতজ্ঞতা তো ঢেলেই দিতে হবে!
কারণ এখানে-যে এর আগে আর কেউ আসে নি শুধু তিনি ছাড়া!
ডাকাই-যে হয় নি!
শুধু তাঁকেই ডেকে এনেছেন আল্লাহ!
আহা! শ্রেষ্ঠ নবীর কী শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য!
এরপর আল্লাহ তাঁকে একে একে দিলেন অনেক উপহার!
সবচে' বড় উপহারটা কী?
নামাযের উপহার! পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সেরা উপহার!
যে নামায আদায় করতে হবে কা'বামুখী হয়ে।
এরপর আল্লাহ তাঁর প্রিয় মুহাম্মদকে বিদায় দিলেন।
আবার তিনি ফিরে এলেন দুনিয়ায়।
প্রথমে এসে নামলেন সেই মসজিদুল আকসার বাইরে।
তারপর আবার প্রবেশ করলেন ভিতরে।
সেখানে সমবেত স-ব নবী রাসূলকে বিদায় জানিয়ে আবার এসে আমার উপর চড়ে বসলেন। শুরু হলো কা'বার দিকে ফিরে যাওয়া। ... না, বেশিক্ষণ লাগে নি, মুহূর্তেই আমরা পৌঁছে গেলাম মক্কায়—কা'বা চত্বরে!

এভাবেই সমাপ্ত হলো মুহাম্মদের মহাকাশ ভ্রমণ। আল্লাহ্‌র সকাশে (দরবারে, সান্নিধ্যে) হাজির হওয়ার অপূর্ব গৌরব। আমি মুহাম্মদকে বিদায় জানালাম। তিনি চলে গেলেন গৃহে।

পরদিন আল্লাহ্‌র রাসূল কা'বায় হাজির হয়ে সবাইকে জানালেন তাঁর এই মহাভ্রমণের কথা। ইসরা ও মি'রাজের কথা। কোরাইশের কাফির মুশরিকরা তা বিশ্বাস করলো না। আবু জেহেল তো একে 'ডাহা মিথ্যা' বলেই উড়িয়ে দিলো। ওদের একজন ঠাট্টা করে বললো, আমরা একমাসেও জেরুজালেম পৌঁছতে পারি না

আর মুহাম্মদ কি না এক রাতেই সেখানে গিয়ে আবার ফিরেও এসেছে! কী আজগুবি কথা!

ঠিক তখনি সেখানে এসে হাজির হলেন আবু বকর রা.। এসে বসলেন আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছ ঘেঁষে। তখন কাফেরদের মুখ থেকেই তিনি শুনলেন রাসূল কী বলেছেন এবং তারা কতোটা বিস্ময় প্রকাশ করে রাসূলের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কাফের ও রাসূলের মাঝে এ নিয়ে কথা চলতে লাগলো। এ ব্যাপারে রাসূল যাই বলছেন কাফেররা তাই অস্বীকার করছে। শেষ পর্যন্ত কাফেররা বললো, ঠিক আছে; মুহাম্মদ তাহলে বলুক, মসজিদুল আকসা দেখতে কেমন? কী আছে তার ভিতর? কয়টি তার দরোজা জানালা? আসলে এ-সব বলে তারা রাসূলকে আটকে দিতে চেয়েছিলো। লা-জওয়াব করে দিতে চেয়েছিলো। তারা ধরেই নিয়েছিলো যে, মুহাম্মদ এক রাতে ওখানে যেতেই পারে না। সুতরাং তার পক্ষে এর বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীকে লজ্জিত করলেন না। জওয়াবে আল্লাহ্‌র নবী মসজিদুল আকসার আকার-আকৃতি একে একে ওদের সামনে বর্ণনা করে যেতে লাগলেন। এমনভাবে যেনো আল-আকসা তাঁর চোখের সামনে ভাসছে!
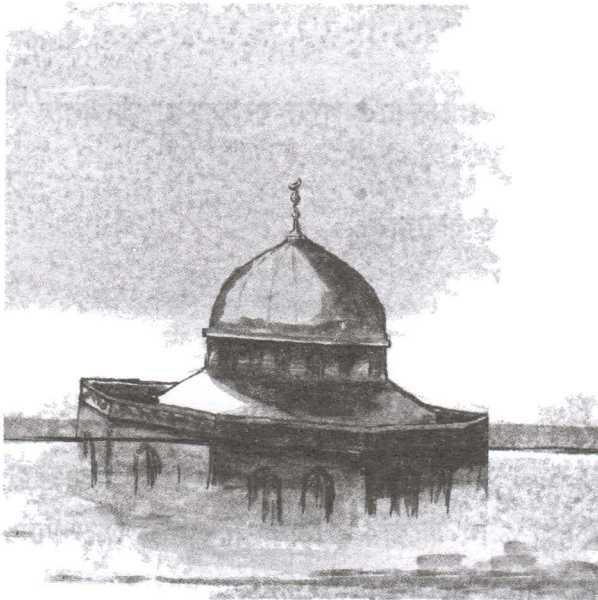
আর তিনি দেখে দেখে সব বলে যাচ্ছেন। এতে সবাই বিস্ময়ে যেনো পাথর হয়ে গেলো! আবু বকর আবেগভরে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি সত্য বলেছেন!

এদিকে আল্লাহ্‌র রাসূল কাফেরদের বিস্ময় আরো বাড়িয়ে দিলেন ঐ সব কাফেলার কথা উল্লেখ করে যাদের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিলো মক্কা থেকে একটু দূরে। তারপর যখন ঐ সব কাফেলা ফিরে এলো এবং প্রথম কাফেলার হারিয়ে যাওয়া উটটিও ফিরে এলো, দ্বিতীয় কাফেলার পা ভেঙে-যাওয়া উটটিও ফিরে এলো এবং আরো ফিরে এলো তৃতীয় কাফেলার কালো বোঝা বহন-করা সেই উট দু'টিও, তখন এ-ঘটনা অস্বীকার করতে ওদের একটু মুখ-লজ্জাই হলো।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

তবু মন ওদের ঘুরলো না!

বিবেক ওদের দুললো না!

চেতনা ওদের জাগলো না!

ঈমানও ওদের নসীব হলো না!

তখন বিস্মিত কাফেরদের ভিতরে আবার শোনা গেলো হযরত আবু বকরের নির্দ্বিধ কণ্ঠ:

-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি অবশ্যই সত্য বলেছেন! আপনার সব কথাই আমি বিশ্বাস করলাম!

তখন নবীজী আনন্দভরা কণ্ঠে বললেন:

-আবু বকর! তুমি 'সিদ্দীক'!

তখন থেকেই আবু বকর রা. -এর সাথে এই 'সিদ্দীক' উপাধী একাকার হয়ে যায়!

বন্ধু!

আমি বোরাক! যে কাহিনী আমি বলা শুরু করেছিলাম তা এখানেই সমাপ্ত করবো। শেষে বলতে চাই, ইসরা ও মি'রাজের মু'জিযা যতোদিন আলোচিত হবে ততোদিন সায়্যিদুল মুরসালিনের সাথে আমিও আলোচিত হবো। এ আমার চরম সৌভাগ্য।

প্রায় ১৫ শত বছর আগেই আল্লাহ আমাকে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়! কোনো কিছুই তাঁর কুদরত ও চাওয়ার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হ্যাঁ, তিনি যা চান তা-ই হয়! যখন চান তখনই হয়! হবেই তো! তিনি-যে 'কুন ফায়াকুন'-এর মালিক! রকেটের গতি কিংবা উপগ্রহের দ্যুতি— তাঁর ইচ্ছের সামনে সবই চিরম্লান। এ-ঘটনাকে অস্বীকার করার দুর্মতি মানেই দুর্গতি। পবিত্র কুরআনে আছে এ-ঘটনার কথা। বিদায়ের আগে অনুরোধ করে যাই— আয়াতটা একটু পড়ো। প্রবেশ করো গভীরে— অর্থ ও ভাবের। দেখবে কী মজা!

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

মহিমান্বিত সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ) কে মসজিদুল হারাম (কা'বা) থেকে মসজিদুল আকসা (বাইতুল মাকদিস) পর্যন্ত নৈশভ্রমণ করিয়েছেন, যার আশপাশ আমি বরকতময় করে দিয়েছি। যাতে আমি আমার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সবশ্রোতা ..সর্বদ্রষ্টা। -সূরা ইসরা।

আমি সাপ

আমি জানি, তোমরা সবাই এক যোগে বলবে, ‘নাউযুবিল্লাহ—বাঁচাও! বাঁচাও!! আল্লাহ পানাহ’! না বন্ধু, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি অনেক দূরে! তা ছাড়া সব সাপ সব মানুষকে দংশন করে না, সে কথা আমার কাহিনী শুনলেই বুঝতে পারবে।

আমার জন্ম অনেক অনে-ক কাল আগে। আমি থাকতাম মক্কা নগরীর একটা পুরোনো ভবনের ফাটলে। ভবনটার নাম ‘দারুন নাদওয়া’—পরামর্শকেন্দ্র। সেখানে সবাই এসে জড়ো হতো এবং নানা বিষয়ে সলা-পরামর্শ করতো। একদিন আমি আমার ‘ঘর’ থেকে বের হয়ে দেখি, জমকালো পোশাক-পরা একটা ‘মানুষ’। একটু গভীর করে তাকালাম। হুঁ, চিনতে এবার মোটেই অসুবিধা হয় নি। ও মানুষ না, শয়তান—জলজ্যান্ত শয়তান। আমি বললামঃ

-তোকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। তুই ইবলিস—শয়তান!

-সাবধান, আস্তে কথা বল্! আমার নাম ধরে চিল্লাচিল্লি করবি না, কেউ শোনে ফেলতে পারে!

-কিন্তু তুই এখানে কেন্? এখানে তো তোর থাকার কথা না! কোন্ মতলবে এসেছিস্?

-আমি মুহাম্মদকে চাই! তার কবল থেকে মুক্তি চাই! এই লোক সারাটা দুনিয়া উলট-পালট করে দিচ্ছে! তার হৃদয় থেকে এমন একটা আলো বিচ্ছুরিত হয়, যা শয়তানদের চোখের আলো কেড়ে নেয়! এই সাপ! তুই তো জীবনে আমার অনেক উপকার করেছিস, আজ শেষ উপকারটা করবি?

আমি শয়তানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার কথার কোনো উত্তর করলাম না। আমি জীবনে এই ইবলিসকে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটনে অনেক সহযোগিতা করেছি। এ জন্যে সব সময় মানুষের কাছে আমি ঘৃণার পাত্র, মূর্তিমান আতঙ্ক। আমাকে দেখলেই মানুষ ছুটে পালায়। হায়! আমার দংশনে কতো নিরপরাধ মানুষ অকালে ঝরে পড়েছে!

এখন আমার মনে একটা উত্তম চিন্তার উদয় ঘটেছে। অর্থাৎ আমি চাইছি, জীবনটাকে অপরাধের অন্ধকার থেকে এবার টেনে তোলবো। আর না, কোনো মানুষকে আর বিষায়িত করবো না—ছোবল দেবো না। ইবলিসকে আর সহযোগিতা দেবো না। ইবলিসের কথায় উত্তর না করে আমি এ-সবই ভাবছিলাম। আমি আরো ভাবছিলাম, কী করে ইবলিসকে মুহাম্মদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া যায়। এর মাঝেই দেখলাম একদল মানুষ হুড়হুড় করে 'দারুন নাদওয়ায়' এসে ঢুকলো। আমি তড়িৎ গতিতে সুরঙ্গে লুকিয়ে গেলাম। তবে কান পেতে রইলাম ওদের কথাবার্তা শোনার জন্যে। বিশেষ করে ইবলিস কী বলে তা শুনতে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।
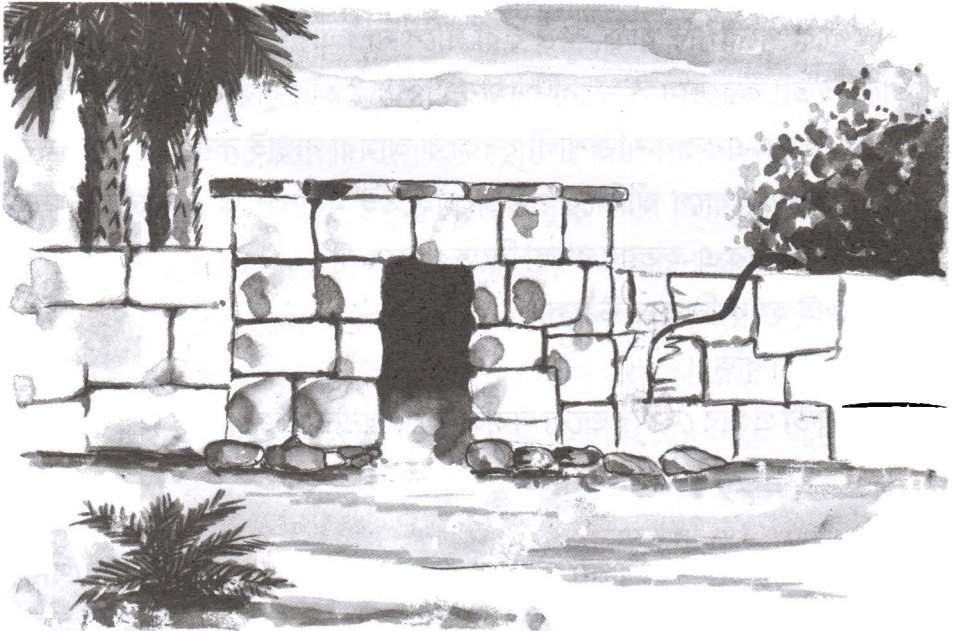
সবাই বসলো। আলোচনা শুরু হলো। কী করে মুহাম্মদ-এর কবল থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং কী করে তার নতুন দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেয়া যায়— এ-সব নিয়েই গরম গরম আলোচনা শুরু হলো।

একজন বললো:

-তাকে বন্দি করে রাখলে কেমন হয়?

ইবলিস নড়েচড়ে বসলো, বললো:

-না, এটা কোনো জুতসই কাজ হবে না, যে কোনো সময় সে পালিয়ে যাবে।

আরেকজন বললো:

-তাহলে চলো তাকে শহর থেকে বের করে দিই!

ইবলিস এবারও বাধ সাধলো, বললো:

-লাভ নেই, আবার ফিরে আসবে!

এভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করলো। কিন্তু একটা প্রস্তাবও মানুষরূপী ইবলিসের মনমতো হলো না। অবশেষে ইবলিস নিজেই একটা নতুন প্রস্তাব পেশ করলো। যেমন ইবলিস তেমন প্রস্তাব। বললো:

-আমি মনে করি; মুহাম্মদকে একেবারে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া তার কবল থেকে পুরোপুরি মুক্তি লাভ করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো, কী উপায়ে আমরা তাকে হত্যা করবো। এ জন্যে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তা হলো, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন শক্তিশালী যুবককে আমরা বাছাই করবো। তারা সবাই রাতের আঁধারে এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে, মুহূর্তেই মুহাম্মদকে শেষ করে দেবে। তাহলে তার গোত্র আর এ-হত্যার বদলা নিতে পারবে না!

উপস্থিত সকলেই হর্ষধ্বনি করে উঠলো:

-খাসা প্রস্তাব! খাসা বুদ্ধি!!

এমন সুন্দর একটা প্রস্তাব দেয়ার জন্যে সবাই তাকে ধন্যবাদ জানালো।

✺ ✺ ✺

এরপর শুরু হলো প্রস্তাব বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। আমি আমার ‘কুটির’ থেকে বেরিয়ে এলাম। রাতের আঁধারকে আশ্রয় করে আমি মুহাম্মদের ঘরের দিকে ছুটে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম; পরিস্থিতি মোটেই ভালো না। সবাই নাঙা তলোয়ার হাতে তাঁর ঘরটিকে ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলেছে। জিঘাংসা-কাতর দৃষ্টিতে অপেক্ষা করছে তাঁর বাইরে আসার। এলেই সবাই এক যোগে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাঁকে শেষ করে দেবে!

ওরা মাঝে মাঝে দরোজার ছিদ্র দিয়ে দেখে নিচ্ছিলো বিছানায় মুহাম্মদ আছে কি না। এদিকে হঠাৎ কী-যে ঘটলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। দেখলাম ঘরটিকে ঘিরে-রাখা সবগুলো মানুষ ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে। কোত্থেকে যেনো ওদের চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে। এমনকি আমিও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। সবার মতো আমিও কী এক আশ্চর্য গাঢ় নিদ্রায় নিজের অনিচ্ছায় ঢলে পড়লাম!

✵ ✵ ✵

সূর্যিটা যখন ওদের গায়ে সকাল বেলার 'মিষ্টি পরশ' বুলিয়ে দিলো তখন ওরা জাগলো। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় ওরা বিস্মিত! ওরা বুঝতে পারছিলো না— এ কী ঘুম পেয়েছিলো ওদেরকে! সেই 'মায়াবী' ঘুমের রেশ মুখে নিয়ে ওরা ছুটে গেলো দরোজায়! ছিদ্র দিয়ে দেখলো, মুহাম্মদের বিছানায় যে শুয়েছিলো সে মুহাম্মদ নয়— আলী! ওদের মাথায় যেনো তলোয়ারের আঘাত পড়লো!

✵ ✵ ✵

বন্ধু! আলী কেনো শুয়েছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানায়? উত্তর হলো, নবীজীরই নির্দেশে। নবীজীর ইয়েমেনী সবুজ চাদরটা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন তিনি। নবীজী তাঁকে রেখেই এক সময় বেরিয়ে গেছেন, রাতের অন্ধকারে! আর তাঁকে দিয়ে গেছেন অভয়! প্রিয় নবী'র অভয়বাণী শুনে কেনো তবে ভয় পাবেন বীর আলী? যুবক আলী? ভবিষ্যতের খায়বারের দুর্গদ্বার বিজয়ী আলী? বয়স তাঁর কতোই বা হবে, কিন্তু বীরত্ব ছিলো তাঁর স্বভাব গুণ! তাই এক ঝাঁক নাঙা তলোয়ারের নিচে শুয়ে থাকতে তাঁর একটুও ভয় লাগে নি! বীরপুরুষ এমনই হয়! নবী-প্রেমিকরা এমনই হয়!

মূল ঘটনায় ফিরে আসি। আলী বের হয়ে আসতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরলো। জাপটে ধরলো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলো।

-তুমি?! তুমি কেনো এখানে?
-জলদি বলো, মুহাম্মদ কোথায়?
-বলো, রাতে কোথায় ছিলো মুহাম্মদ?
স-ব প্রশ্নের জবাবে বীর যুবক আলী'র এক জবাবঃ
-আমি জানি না! আমি জানি না!!
সবাই তখন আলীকে কা'বা চত্বরের দিকে ধরে নিয়ে গেলো। কেউ কেউ তার গায়ে হাতও তুললো। কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্ঘাটিত না হওয়ায় ওরা কিছুক্ষণ পর এই আত্মোৎসর্গী বীরকে ছেড়ে দিলো। মুক্ত বীর এখন আনন্দ-বিহ্বল। এতো বড় দায়িত্ব পালন করতে পারলে কে-না আনন্দ-প্লাবিত হয়! তার সমানে এখন আরেকটা দায়িত্ব আছে। নবীর কাছে গচ্ছিত রাখা আমানতের মাল মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া!

✵ ✵ ✵

মুহাম্মদ ও আবু বকর ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন মক্কা থেকে। সেই মক্কা, যেখানে পেয়েছেন তাঁরা কেবলই কঠোরতা, শুধুই পৈশাচিকতা! একদল মানুষের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা! এদিকে ইবলিস ঘটনা জানতে পেরে চীৎকার জুড়ে দিলোঃ
-কী করে সে অতগুলো সশস্ত্র মানুষের চোখে 'ধুলো দিয়ে' চলে যেতে পারলো!
এরপর ইবলিসটা আমার দিকে চোখ লাল করে তাকিয়ে বললোঃ
-এই সাপ! তুই কোথায় ছিলি! কেনো মুহাম্মদের পথ আগলে দাঁড়াস নি!
আমি বললামঃ
-সে আর পারলাম কই! তিনি আমার আগেই তো চলে গেলেন!
নজদের শায়খরূপী ইবলিস এবার জ্বলে উঠলোঃ
-মিথ্যে বলছিস তুই! ইচ্ছে করলেই বাধা দিতে পারতিস! অন্য সাপদেরকে জানিয়ে দিলি না কেন্? তাহলেই তো কেউ-না-কেউ ছোবল বসিয়ে দিতে পারতো! তুই একটা অপদার্থ! মনে রাখিস্! আমি তোরে উচিত শিক্ষা দেবো!

এ-কথা বলে ইবলিস হনহন করে চলে গেলো। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সুরাকা বিন মালিককে বললোঃ
'তাড়াতাড়ি মুহাম্মদের খোঁজ লাগাও! পুরস্কার পাবে, মোটা পুরস্কার!

মুহাম্মদ এবং প্রিয় সাহাবী আবু বকর গিয়ে আশ্রয় নিলেন গারে সাওরে। আত্মগোপন করে থাকলেন। সে গুহায় ছিলো অনেক ছিদ্র। ছিদ্রে ছিদ্রে ছিলো সাপের বসবাস। এরা সবাই আমার এবং ইবলিসের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে ছিলো। আবু বকর ব্যাপারটা চিন্তা করে অনেক সতর্ক ছিলেন। সাপেরা আমাকে পরে জানিয়েছে যে আবু বকর প্রথমে মুহাম্মদকে ঢুকতে দেন নি। বরং নিজে ঢুকে সাপের ছিদ্রগুলো একে একে বন্ধ করে দিয়েছিলেন— নিজের পোশাক ছিঁড়ে ছিঁড়ে। সবগুলো ছিদ্রের মুখ তিনি বন্ধ করতে পারলেও কাপড়ের টুকরো শেষ হয়ে যাওয়াতে একটা ছিদ্র বন্ধ করতে পারলেন না। অগত্যা সেখানে নিজের প্রিয় পা'টাই দিয়ে রাখলেন! প্রিয়কে বিপদমুক্ত রাখতে প্রিয় উৎসর্গ করার কী আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টান্ত!

তখন যা ঘটা স্বাভাবিক ছিলো তাই ঘটলো! একটি সাপ মুহাম্মদের প্রিয় বন্ধুটির প্রিয় পা'টায় ছোবল মারলো! নবীজী তখন আবু বকরের উরুতে মাথা রেখে আরাম করছিলেন। তাই তীব্র ব্যথা সত্ত্বেও আবু বকর নড়লেন না, সাপের নীল বিষ নিয়েই নীরবে বসে রইলেন। তাঁর চোখ বেয়ে বেয়ে পড়ছিলো বেদনা-সঞ্জাত টপটপ 'নীল' অশ্রু! আল্লাহ্‌র রাসূলের গালে এসে পড়লো যখন সেই গরম অশ্রুর একটা ফোঁটা তখন তাঁর নিদ্রা ভেঙে গেলো। দেখলেন আবু বকর কাঁদছেন নীরবে। কারণটা জানলেন। তারপর নিজের মুখের একটু লালা লাগিয়ে দিলেন আক্রান্ত স্থানে। নিমেষেই ব্যথা দূর হয়ে গেলো! আবু বকর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারলেন! যেনো কিছুই হয় নি!!

তিনদিন পর তিনি মুহাম্মদকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন গারে সাওর থেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছুটে চললেন মদীনার দিকে। তাঁদেরকে কেউ আটকাতে পারলো না। না ইবলিস। না আমি এবং আমার সঙ্গীরা। না শত উট-লোভী সুরাকা। আল্লাহ মুহাম্মদকে হিফাযত করেছেন। তিনিই সর্বোত্তম হিফাযতকারী। তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না! তাঁর ইচ্ছাই সব সময় কার্যকর হয়। ইন্নাহু ফা'আলুল্ লিমা ইয়ূরিদ!

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ . ﴾

'আর যখন কাফেররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিলো তোমাকে বন্দি করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা (মক্কা থেকে) বের করে দিতে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, আল্লাহ্‌ও (তোমাকে উদ্ধারের জন্যে) কৌশল করছিলেন, আর আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।' -সূরা আনফাল

আমি কবুতর বলছি

আমি সাদা রঙের। মানুষ আমাকে শান্তির প্রতীক মনে করে, বলে— 'শান্তির পায়রা'। এ জন্যেই বুঝি আমাকে নিয়ে কবিরা লিখেছেন কবিতা, গেয়েছেন শান্তির জয়গান। শিল্পের রঙধনুতে রাঙিয়ে দিয়েছেন কবিতার আকাশ। লেখকেরা আমার বর্ণনায় লিখেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। গেয়েছেন কতো স্তুতিগান। তাদের সব সৃষ্টিগাথার সার কথা একটাই— আমি শান্তি ও সমৃদ্ধির আধার। কিন্তু এ-সবে আমার তেমন গা নেই। গর্ব করার মতোও কিছু খুঁজে পাই না। আমার গর্ব ও মর্যাদার উৎস অন্যখানে। হ্যাঁ, সে কথা বলতেই আমি তোমাদের মাথার উপর উড়ছি। একটু বসতে দেবে? ...
তাহলে শোনো সে গর্বের কাহিনী—

মসজিদুল হারামের আকাশটাই আমার ঠিকানা—বিচরণক্ষেত্র। মনে চাইলে ডানা মেলে মনের সুখে এখান থেকে ওখানে যাই। ওখান থেকে এখানে আসি। উড়ে উড়ে দেখি মসজিদুল হারামের শোভা। আরো দেখি কা'বা-কেন্দ্রিক তাওয়াফকারীদের 'অবিরাম' ছুটে চলা। কখনো এসে নামি কা'বা চত্বরে। এটা সেটা কুড়িয়ে খাই, নির্ভয়ে। কেউ আমার কোনো ক্ষতি করে না। বরং আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখে। 'কেউ কেউ তো আমার মাথায় আদর করে হাত রাখে— দিয়ে যায় স্নেহভরা কর-স্পর্শ'! তখন আমার খুব ভালো লাগে। সবাইকে বন্ধু-বন্ধু লাগে। কখনো আমি নীরবে তাকিয়ে থাকি কা'বার স্বর্গীয় সৌন্দর্যের দিকে। উপভোগ করি তার শোভা। ভাবি, কী সুন্দর কা'বার শোভা! এ-শোভায় কী ছায়া! কী মায়া!!

সেদিন সকালে আমি মক্কার অদূরে একটা গুহার উপরে উড়ছিলাম। ডিম পাড়ার একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলাম। ডিমে তা দিয়ে দু'টি বাচ্চা ফোটানোর জন্যে জায়গাটা নিরিবিলি হওয়া জরুরী। এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম অনেক সাপ গুহাটায়। মনে হলো, ওরা যেনো কারো অপেক্ষা করছে। আমি গুহায় নামতে পারলাম না। নামলেই-যে ওরা আমাকে ছোবল দেবে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে একটা মাকড়সার সাথে আমার দেখা হয়ে গেলো। আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম:

-এই, এখানে এতো সাপ কেনো? কেনো ওরা ভীড় করেছে?

মাকড়সাটি বললো:

-আমি ঠিক জানি না। তবে শুনেছি, মক্কার বড় সাপটা নাকি সবাইকে এখানে আসার নির্দেশ দিয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, দু'জন মানুষের পথে বাধা সৃষ্টি করা।

আমি জানতে চাইলাম:

-কোন্ দু'জন? কে তারা? তাদেরকে বাধা দিতে হবে কেনো?

মাকড়সা বললো:

-আমি ঠিক জানি না। তবে তুমি তো আকাশে উড়তে পারো। দেখোই-না একটু, কোথাও কিছু নজরে পড়ে কি না!

আমি উড়াল দিলাম। অনেক উপরে উঠে এলাম। বেশ খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর দেখতে পেলাম আবু বকরকে সাথে নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল এ-দিকে আসছেন। তাঁদের মাঝে কথা হচ্ছিলো একটা নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে, যেখানে কয়েকটা দিন আত্মগোপন করে থাকা যাবে। আমি বুঝতে পারলাম, আগে থেকেই তাঁরা এ-গুহাটা নির্বাচন করে রেখেছিলেন। তাঁদের পরবর্তী গন্তব্য ইয়াসরিব—মদীনা। আমি তাঁদের আগে আগে উড়তে লাগলাম। তাঁদেরকে 'পথ দেখাতে' লাগলাম। নবীজী এবং আবু বকরের জন্যে আমার মনটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো। এই-যে তাঁরা গুহায় যাচ্ছেন, সেখানে তো অনেক সাপ! কেমন করে তাঁরা সেখানে থাকবেন? রাত কাটাবেন? একাধারে কয়েকদিন?

সাপ-কোপের বিষয়টা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। এদিকে মক্কার কাফির

মুশরিকরাও নিঃসন্দেহে তাঁদের পিছু নেবে। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার মনটা আবার কেঁপে উঠলো। হায়, কী অবস্থা! সামনে সাপ! পেছনে শত্রু! সব মিলিয়ে আমার খুব ভয় করছিলো। তাঁদের বিপদের আশঙ্কায় আমার বুকটা দুরুদুরু করতে লাগলো। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ! আমি স্বস্তি ফিরে পেলাম যখন দেখলাম, আবু বকর আগে গিয়ে সবগুলো গর্ত কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। একটা গর্ত কাপড়ের অভাবে বন্ধ করা গেলো না। আহা, আমি যদি সেটি আমার শরীর বিছিয়ে বন্ধ করতে পারতাম! হায়! আমি যদি আরো আগে এসে গুহাটা সাফ করে দিতে পারতাম!

মাকড়সাটিও দেখলাম ঐ গর্তটা খোলা থাকায় আমার মতোই ভীষণ উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেরা নবীর সেরা উম্মত হযরত আবু বকর আমাদের দুশ্চিন্তা স্থায়ী হতে দিলেন না। তিনি নিজেই তা পা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন! আল্লাহু আকবার! নবীজীর জন্যে কী তাঁর মায়া ও দরদ! সাপের কামড়ে দংশিত হওয়ার আশঙ্কাকে কী অবলীলায় তিনি উপেক্ষা করলেন, শুধু প্রিয়নবীর নিরাপত্তার কথা ভেবে!

আমি কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। কেবল এদিক ওদিক ওড়াউড়ি করছিলাম। ভয়ে উদ্বেগে। মাকড়সা আমার এ অবস্থা দেখে বললো:

-কী ব্যাপার! তুমি এতো অস্থির যে! ডিম পাড়ার একটা ভালো জায়গা খুঁজে নিলেই পারো! অমন অস্থির হয়ে ওড়াউড়ি করছো কেনো?

আমি বললাম:

-বন্ধু! আমি ডিমপাড়া নিয়ে ভাবছি না। আমি আশঙ্কা করছি নবীজী এবং আবু বকরের কোনো বিপদ না হয়! কাফির মুশরিকরা কখন এখানে ছুটে আসে— বলা তো যায় না!

এই বলে আমি মক্কার দিকে উড়ে গেলাম। অনেক দূর যাওয়ার পর আবার ফিরে এলাম। ফিরে এলাম রাজ্যের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে! এসেই মাকড়সাকে বললাম:

-বন্ধু! একটু ভেবে দেখেছো কি, কাফির মুশরিকরা এখানে চলে এলে তাঁদের কী অবস্থা হবে? বাঁচার তো আমি বাহ্যিক কোনো উপায় দেখছি না! আমরা কি কিছু একটা করতে পারি না!

মাকড়সা একটু চুপ থেকে বললো:

-আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে! আমি এই মুহূর্তে গুহাটার মুখে জাল বুনে মুখটাকে ছেয়ে ফেলবো!

আমি তো অমন অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা শোনে প্রথমটায় হেসেই উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। বুঝতেই পারছিলাম না মাকড়সার পাতলা জালে কী করে গুহার মুখ আটকে দেওয়া সম্ভব! কিন্তু পরক্ষণেই মনে এলো— না, এটা চমৎকার একটা কৌশল! এ ছাড়া আমিও তো তার সাথে যোগ দিতে পারি!

তাই করলাম। মাকড়সা দ্রুত জাল বুনে যেতে লাগলো আর আমি গুহার মুখের কাছেই একটা 'বাসা' তৈরী করে ডিম পাড়লাম এবং তা দিতে লাগলাম!
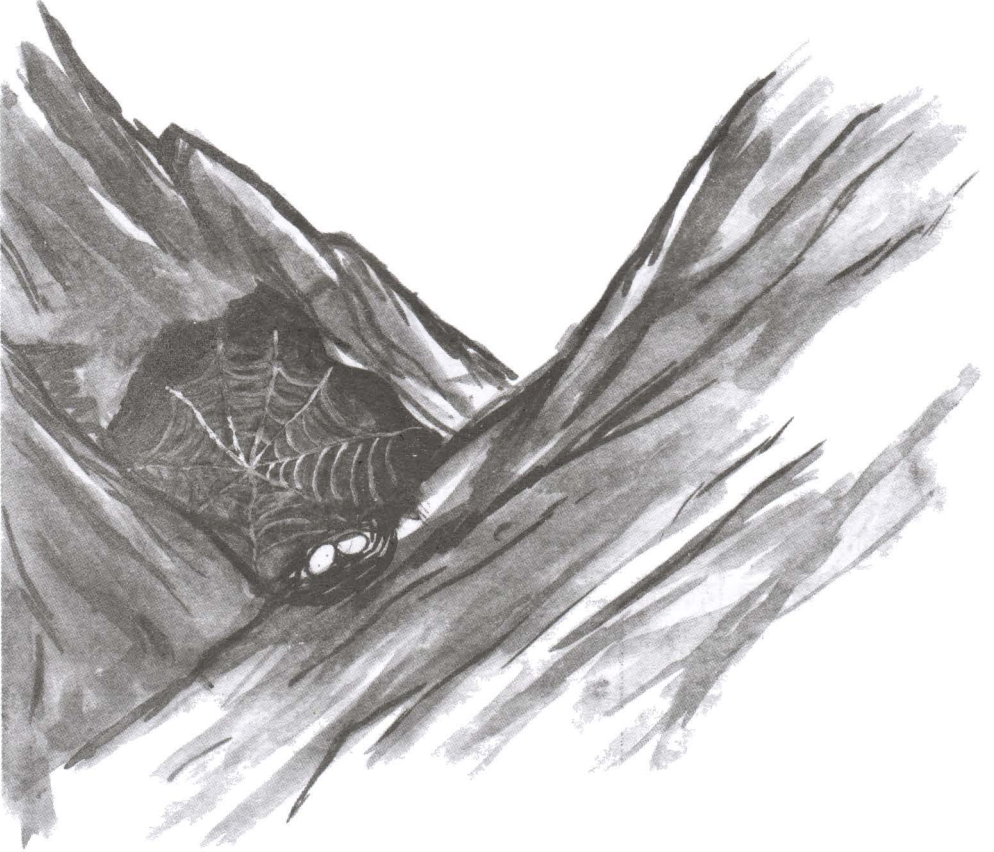
আমার আশঙ্কাই সত্য হলো। কাফেররা সত্যি সত্যি চলে এলো। একেবারে গুহার মুখে। আমি কান পেতে রইলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম ওরা বলছে:

-মুহাম্মদ ও আবু বকর এখানে এই গুহাটায় লুকিয়ে নেই তো!

-হয়তো বা!

-অবশ্যই তারা এখানে আছে!

আরেকজন বললো:

-অসম্ভব! এখানে থাকবে কী করে! এটা তো সাপ-কোপে ভরা!

এভাবে ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলতে লাগলো।

একজন বলে:

-প্রবেশ করবো ..।

আকেজন বলে:

-না, প্রবেশ করবো না!

আরেকজন বলে:

-কেনো ঢুকবো না? দেখতে অসুবিধা কী?

অপরজন উত্তর দেয়:

-কেনো ঢুকবো? শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

এভাবে আওয়াজ উচ্চ হতে লাগলো। মতবিরোধ বাড়তে লাগলো। একজন বেশ বুদ্ধিমানের মতোই বললো:

-চলো তো! এখানে কালক্ষেপণ করে লাভ নেই! এখানে দীর্ঘদিন কেউ ঢুকে নি!

আরেকজন বললো:

-কী করে বুঝলে?

-কী করে বুঝলাম মানে? তুমি দেখছি একটা হাদারাম, চেয়ে দেখো; মাকড়সা গুহার মুখে কেমন জাল বুনে বসে আছে! কেউ ঢুকলে কি আর এই জাল অক্ষত থাকে, না মাকড়সা থাকতে পারে?! তা ছাড়া ওই যে দেখো; একটা কবুতর ডিমে তা দিচ্ছে! কেউ এখানে ঢুকলে কবুতরটা কি এখানে কি অমন করে বসে থাকতো ? বরং

ডিমগুলো ভেঙে পড়ে থাকতো! নিশ্চিত এখানে অনেক দিন কেউ আসে নি!
সবাই তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললো:
-তুমি ঠিকই বলেছো! আমরা এ-সব চিন্তা করে দেখি নি! এখানে কেউ থাকতে পারে না। চলো .. চলো!

✷ ✷ ✷

এরা দূরে চলে গেলো!
আরো দূরে! আ-রো দূরে!
আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম!
যেই ওরা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো, অমনি আমি বাসা ছেড়ে আকাশে উড়াল দিলাম! ডানা ঝাপটে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলাম! আর বন্ধু মাকড়সাটি সরচিত জালে মনের হরষে নাচতে লাগলো!
আহা, যদি আমাদের মনের এ বান-ডাকা আনন্দ-স্রোত তাঁদের সামনে বইয়ে দিতে পারতাম—প্রকাশ করতে পারতাম! যদি তাঁদের বোধগম্য ভাষায় বলতে পারতাম—আমরাও তোমাকে ভালোবাসি হে নবী! আমরাও তোমাদের হিজরতের এ-অভিযানে সঙ্গে আছি হে প্রিয়!

✷ ✷ ✷

তিনদিন পর নবীজী এবং আবু বকর আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে নতুন করে পথচলা শুরু করলেন। গারে সাওর ছিলো তিনদিনের আশ্রয়স্থল। এখন গন্তব্য ইয়াসরিব—মদীনা। আমি তাঁদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে উড়ে ডানা ঝাপটে তাদের উদ্দেশে বলতে লাগলাম—মা'আস্ সালামাহ্! নিরাপদে পৌঁছো তোমরা মদীনায়!

﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

‘যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেররা তাঁকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিলো, তিনি (নবী) ছিলেন দু‘জনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি নিজের সঙ্গীকে বললেন, দুশ্চিন্তার কী আছে, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখোনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই সদা চিরসমুন্নত। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। -সূরা তাওবা

আমি ঘোড়া

আমি যেতে চাই না তবু আমাকে যেতে হবে। কারণ আমার মনিব চান শত উটের পুরস্কার আর আমি চাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর নিরাপদে পৌঁছে যান মদীনায়। শেষ পর্যন্ত আমার মনিবের ইচ্ছেরই জয় হলো। আমাকে বের হতেই হলো। লাগামটা-যে তার হাতে, যেদিকে টানেন সেদিকেই আমাকে যেতে হয়। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে'র কোনো মূল্য নেই। মনিব বুঝলেন না আমার বোবা কান্না। মনিব অনুভব করলেন না আমার মুহাম্মদপ্রীতি। আশ্চর্য! জন্তু হয়ে আমি তাঁকে চিনলাম আর মানুষ হয়ে তিনি তাঁকে চিনলেন না। আমার মুহাম্মদপ্রীতির উপর চেপে বসলো তার সম্পদপ্রীতি। সম্পদের লালসা মানুষকে এতো অন্ধ করে দেয় কেনো? ..

সময়টা ছিলো সকাল। মনিব সুরাকা বিন মালিক ছুটে চলেছেন সমুদ্র উপকুলের দিকে। উদ্দেশ্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ও আবু বকরকে ঠেকানো এবং কোরাইশের নিকট ধরিয়ে দেওয়া।
সুরাকার মতো আরো অনেকেই এ-অভিযানে বেরিয়েছিলো। কারণ ঐ একটাই। কোরাইশ ঘোষণা দিয়েছে— যে বা যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনতে পারবে, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে শত উটের পুরস্কার!

বের হওয়ার মুহূর্তে ইবলিস—শয়তান আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে দিয়েছে, আমি যেনো সর্বশক্তি ব্যয় করে মনিবকে সহযোগিতা করি—মুহাম্মদের পথে বাধা হয়ে

দাঁড়াই। এতে নাকি সে আমাকে একটা নতুন জিন (ঘোড়ার গদি) আর আমার মালিককে একশত উট উপহার দেবে। আমি অবশ্য ইবলিসের পুরস্কারে একটুও লালায়িত (আগ্রহী) নই। কিন্তু আগেই যেমনটা বলেছি, আজ আমি আমার ইচ্ছে'র বিরুদ্ধে বের হয়েছি। আমার মনিব আমাকে মারধোর করে রাস্তায় টেনে এনেছেন। শক্ত হাতে লাগাম ধরে তিনি এগিয়ে চলেছেন। সাথে নিয়েছেন বর্শা ও তীর-ধনুক। আরো নিয়েছেন ভাগ্য পরীক্ষার কী সব 'হাবিজাবি'। এ-সব অস্ত্রের বিনিময়ে তিনি নাকি লড়বেন মুহাম্মদ ও আবু বকরের সাথে। তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসবেন কোরাইশের কাছে কিংবা ওখানেই 'শেষ করে' দেবেন। কিন্তু আমার 'প্রাণিমন' কেনো জানি বারবার বলছিলো—

আজ জয় হবে সত্যের।

আজ জয় হবে ন্যায়ের।

আজ জয় হবে মুহাম্মদের।

অন্ধকার কি আলোর উদ্ভাস ঠেকাতে পারে?

✺ ✺ ✺

সুরাকা বিন মালিক একজন শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার। আরব অশ্বারোহী বাহিনীতে তাঁর একটা সুনাম আছে। আর আমি তাঁর চোখে এক শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। তাই আমাদের এই অভিযানকে ঘিরে মক্কাবাসীদের মনে অনেক আশা-ভরসা। তাদের বিশ্বাস; আমরা সফল হবো এবং পুরস্কারটা আমরাই অর্জন করবো।

যাই হোক; অভিযান-সাফল্যের ব্যাপারে সুরাকাও বেশ আশাবাদী ছিলেন। সফলতার কাছাকাছি আমরা প্রায় পৌঁছেও গিয়েছিলাম। মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীকে আমরা প্রায় ধরেও ফেলেছিলাম। আমরা তাঁদের একেবারে কাছে চলে গিয়েছিলাম। আবু বকর তখন ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন গুহায় বসে-বলা সেই উক্তিটি— আবু বকর! উদ্বেগের কিছুই নেই, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন!

কিন্তু অভিযানের চূড়ান্ত পর্বে এসে আমরাই রহস্যের জালে আটকা পড়ে গেলাম!

তাঁদেরকে ধরে ফেলাটা যেখানে ছিলো সময়ের ব্যাপার, সেটিই এখন মনে হচ্ছে সুদূর পরাহত—অসম্ভব!

আরেকটু খুলে বলি—

খুব সাবধানেই আমি পথ চলছিলাম। কিন্তু আচমকা আমি হোঁচট খেলাম, কোনো কারণ ছাড়াই। আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আমার মনিব তাল সামলাতে না পেরে জিন থেকে ছিটকে পড়ে গেছেন! অথচ এর আগে কখনো এমন হয় নি। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া যে-কোনো ঘোড়সওয়ারের জন্যে অপমানজনক। আর সুরাকার মতো শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার হলে তো আরো বেশী লজ্জা .. আরো বেশী অপমান!

✵ ✵ ✵

আমার মনিব আবার উঠে দাঁড়ালেন।

আবার আমার পিঠে চেপে বসলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় যেমন ছিলেন তিনি বিস্মিত ও হতবাক তেমনি ছিলেন ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। তার যেনো তর সইছিলো না। আবার সামনে বাড়তে লাগলেন। যেতে যেতে রাসূল এবং আবু বকরের একেবারে কাছে চলে গেলেন। আরো কাছে। আরো কাছে। রাসূলের কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ তার কানে আসছিলো। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাঁদেরকে থামতে বললেন। তাঁরা থামলেন না। তখন তিনি তাঁদেরকে হত্যা করার হুমকি দিলেন। আরো কাছে চলে এলেন। এবার থামলেন তাঁরা। আল্লাহ্‌র রাসূল আকাশের দিকে তাকিয়ে আরশ-দোলানো কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন— 'ইয়া রব!'

জানি না, কী ছিলো সেই কণ্ঠে! আবারো আমরা দুর্ঘটনার কবলে পড়লাম! এবার আমার সামনের পা দু'টি বালি-ঢাকা একটা পরিত্যক্ত কূপে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেলো। সাথে সাথে মনিবের পা' দু'টিও ডুবে গেলো। একটু আগে মদীনাগামী মুহাম্মদ ও আবু বকরকে 'এই তো ধরে ফেলেছি!'-এর যে আনন্দে মনিব সাঁতার কাটছিলেন, তা যেনো এখন 'অতল' চোরাবালিতে তলিয়ে গেলো! আমি নিজের এবং মনিবের পা টেনে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম! আমাদের চোখে মুখে হতাশা
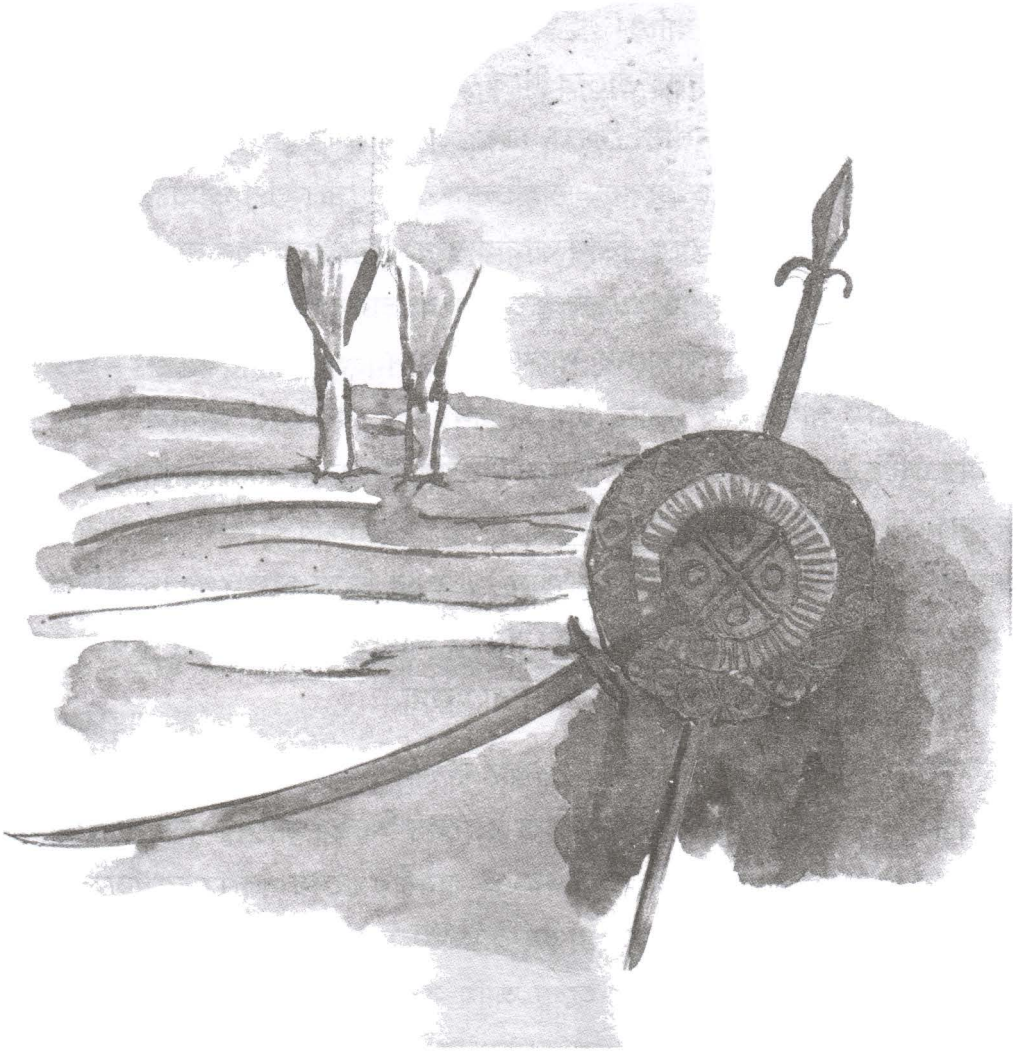
ও অজানা আশঙ্কার কালো মেঘ ছায়া ফেলেছে! আমি ভীত কণ্ঠে হ্রেষাধ্বনি করতে লাগলাম! আর মনিব ভীতি-জড়ানো ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন:

-ক্ষমা করো মুহাম্মদ! বাঁচাও আমাদেরকে! আমরা আর তোমার পিছু নেবো না! এই মুহূর্তে আমরা মক্কায় ফিরে যাচ্ছি!

এরপর আমরা অসহায় দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হচ্ছিলো, সবাই আমাদেরকে এ-কঠিন দশায় ফেলে চলে যাবেন। কিন্তু না; আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত আমাদের কাছে এলেন। ভাবছিলাম কী যেনো ঘটে! আমাদের দু'জনের পা'ই তখন জমিনে ডুবে আছে, তিনি আমাদেরকে মেরে ফেলবেন না তো! অসহায় মৃত্যুর কল্পনায় আমরা কাঁপছিলাম! কিন্তু আমরা যা ভাবলাম তা হলো না, যা ভাবি নি তাই হলো! তিনি এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। একটু নিচু হলেন। তারপর সুরাকা'র ডান পা'টি ধরে জোরে টান দিলেন এবং বের করে আনলেন! তারপর আমার কাছে এসে আমার ডান পা'টি ধরে টান দিলেন এবং বের করে আনতে সক্ষম হলেন! এরপর তিনি এলেন আমাদের বাম পাশে। সুরাকার বাম পা বের করার পর আমার বাম পা'টাও বের করে আনলেন। এরপর তিনি চলে গেলেন সঙ্গীদ্বয়ের কাছে। আমি নয়া জীবন ফিরে পেলাম। সম্ভবত আমার মনিবও। মনে মনে প্রতীজ্ঞা করলাম— আর না, এক্ষুণি আমি ফিরে যাবো মক্কায়।

কী অবিশ্বাস্য! জানি দুশমনের অমন উপকার ক'জন করে! আহা, কী মহা মানব এই মুহাম্মদ! নিজের লোক পাঠিয়ে বিপদমুক্ত করলেন নিজের জানের দুশমনকে! কিন্তু সুরাকা'র মনে কি মুহাম্মদের অদ্ভুত সুন্দর এই মানবীয় গুণের পরশ লেগেছিলো? না, লাগে নি! দুনিয়া-লোভীদের যা অবস্থা হয় আর কি! সুরাকা শিক্ষা নিলেন না। সুরাকা থামলেন না। তার কী-যে দুর্মতি হলো আমি বুঝতে পারলাম না! আবার তাকে লোভে পেয়ে বসলো! শত উটের লোভ! হায়রে লোভ! উপকারীর উপকার ভুলতে এই লোভ-কাতর মানুষটার একটু সময়ও লাগলো না! তিনি উঠে দাঁড়ালেন! সামনে বাড়তে লাগলেন! অনেক কাছেও চলে গেলেন! কিন্তু পারলেন না! হঠাৎ অনুভব করলেন প্রচণ্ড ব্যথা! তার কাছে মনে হচ্ছিলো তিনি যেনো আহত, মারাত্মক আহত! যেনো ক্ষতস্থান থেকে টপকে টপকে রক্ত ঝরছে! তিনি থেমে গেলেন। থমকে

গেলেন। নিশ্চল স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে রইলেন! তারপর সকাতর চীৎকারে রাসূলকে আবার ডাকলেন, আরো কাতর কণ্ঠে! এবারের মতো ক্ষমা করে দেয়ার অনুরোধ করলেন! কসম করে বললেন— 'ক্ষমা করো হযরত!' মক্কায় ফিরে যাবোই! আর তোমার পিছু নেবো না, নেবোই না!

দয়াল নবীর মনে দয়ার ঢেউ উঠলো! তাই প্রাণশত্রুর কাতরতা তাঁকে কাতর করে তুললো! রাসূল তাকে ক্ষমা করে দিলেন! আমরা মুক্তি পেলাম! মুক্তির আনন্দে ভাসতে ভাসতে সুরাকা নবীজীর কাছে আবদার করে বললেন:

-মুহাম্মদ! আল্লাহ তোমার বিপদ-সহায়! আমি কেনো, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না! এখন আমি কি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতে পারি!

হযরত আবু বকর জানতে চাইলেন:

-কী!

সুরাকা বললেন:

-আমি মুহাম্মদের কাছে একটা নিরাপত্তা-পত্র চাই—একটা অভয়-পত্র চাই, ভবিষ্যতে যাতে এই নিরাপত্তা-পত্রের আশ্রয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারি!

নবীজী আবদুল্লাহ বিন উরাইকিতকে নিরাপত্তা-পত্র লিখে দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি একটি চামড়ায় তা লিখে দিলেন।

সুরাকা পত্রটি সসম্মানে সংরক্ষণ করলেন। তারপর তিনি নবীজীকে সহযোগিতা করতে চাইলেন। কিন্তু নবীজী জানিয়ে দিলেন— সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের! তুমি শুধু আমাদের বিষয়টা গোপন রাখবে!

❋ ❋ ❋

সুরাকা আবার আমার উপর সওয়ার হলেন, মক্কার পথ ধরলেন। ফিরে আসতে কী-যে ভালো লাগছিলো আমার, তা বোঝাই কোন্ ভাষায়? আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে আমি বেঁচে গেছি! অমন কঠিন অবস্থা থেকে বেঁচে আসা কি কল্পনা করা যায়? নবীজীর দয়া না হলে তা মোটেই সম্ভব ছিলো না! আমার মনিবেরও আনন্দের কোনো সীমা ছিলো না! যার সাথেই দেখা হচ্ছিলো তাকেই তিনি বলছিলেন— না, আমি মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীর কোনো হদিস পাই নি! তোমরা সব ফিরে যাও! তাঁকে খোঁজে কোনো লাভ নেই! তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে!

এদিকে আমার সাথে দেখা-হওয়া ঘোড়া গাধা ও উটদেরও আমি জানিয়ে দিলাম আমার ভাষায় ঐ একই কথা, যাতে তারা আর ব্যর্থ-চেষ্টা না করে। আমি এবং সুরাকা মিলে যা পারি নি, তারা কী করে পারবে? অসম্ভব!! আমরা যে-ঐশী ঝলক দেখে এসেছি তার সামনে সবাই ঝলসে যাবে! কী দরকার ঝলসে যাওয়ার? সুতরাং সবাই নিরাপদে ফিরে যাক, পরাজয় ঘটুক লোভের! বিজয় ঘটুক শুধু সত্যের! মুহাম্মদ ও তাঁর বন্ধু পৌঁছে যাক মদীনায় নিরাপদে, নির্বিঘ্নে, সমহিমায়, সগৌরবে!

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ . ﴾

'হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।' -সূরা মায়েদা

আমি সেই বকরী

আমার মতো বকরী তোমরা অনেক দেখেছো, কিন্তু ঠিক আমাকে দেখো নি। কারণ আমার জন্ম সে-ই কবে, যখন আল্লাহ্‌র রাসূল হিজরত করেন মক্কা থেকে মদীনায়। আমি মক্কায়ও নয়, মদীনায়ও নয়, থাকতাম এ দু' শহরের মধ্যিখানে—উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে। এক মহিয়সী নারী তিনি। তাঁবুবাসিনী হলেও তিনি ছিলেন ভীষণ উদার ও মায়াবিনী। উদারতা ও দয়ামায়ায় তিনি রাজপুরবাসিনীদেরকেও হার মানান। অনেক আদর-যত্নে আমাদেরকে পালতেন তিনি, যেনো আমরা তার হৃদয়ের টুকরো। কতোকালের আদুরে সন্তান।

একদিন উম্মে মা'বাদ তাঁবুতে বসে ছিলেন। সেদিন আমিও ছিলাম তাঁবুতে। তার স্বামী বেরিয়ে গিয়েছিলেন একটু আগে অন্যান্য বকরীর পাল নিয়ে, খাদ্যের খোঁজে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁবুর সামনে এসে থামলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর। তাঁরা উম্মে মা'বাদের কাছে এসে বিনয়-ধোওয়া ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন:
খাওয়ার মতো কিছু হবে কি?
খেজুর কিংবা গোশত বা অন্য কিছ?
উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তাঁরা তা কিনতে চান!
কেননা ভীষণ ক্ষুধার্ত তাঁরা!
এদিকে যেতে হবে আরো বহু দূরে,
সেই ইয়াসরিবে!

তখন মহিয়সী উম্মে মা'বাদ দরদমাখা কণ্ঠে বললেন:
-আফসোস! আমার কাছে কিছুই-যে নেই!
থাকলে তোমাদের মেহমানদারী করতাম!
আমাদের অভাবের সংসার,
এই আছে এই নেই!
এখন আছি আমি 'নেই'-এর মাঝে
কিছুই 'নেই'-এর মাঝে!

আমি তাঁবুতে বসে সব শুনলাম। মনটা কেমন যেনো ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ক্ষুধায় কষ্ট পাবে তাঁরা, সে কেমন করে হয়? আমি চীৎকার জুড়ে দিলাম— ম্যাঁ .. ম্যাঁ .. ম্যাঁ .. ম্যাঁ!

এতোক্ষণ তো আমি নীরবই ছিলাম! তাহলে এখন কেনো এই চীৎকার? এর সঠিক ব্যাখ্যা আমার জানা নেই! তবে মনের ভিতর থেকে আমি একটা প্রেরণা ও তাগিদ

অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিলো, কে যেনো আমাকে ফিসফিসিয়ে বলছে:
-এই! চুপ করে আছো কেনো? কথা বলো! তোমার উপস্থিতি তাঁদের জানাও, জলদি জানাও!
তাই আমি 'ম্যাঁ-ম্যাঁ' করে উঠলাম! মুহাম্মদ আমার আওয়াজ শুনে উম্মে মা'বাদের কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উম্মে মা'বাদ জানালেন:
-এটি আমার অসুস্থ বকরীটি, ঠিকমত দাঁড়াতেই পারে না। অন্যান্য বকরীর সাথে চারণভূমিতেও যেতে পারছে না।
তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন:
-আচ্ছা, তোমার এই বকরীর ওলানে কি একটু দুধ হবে না!
উম্মে মা'বাদ বিস্ময়ঝরা কণ্ঠে বললেন:
-দুধ! কোত্থেকে আসবে দুধ!! ও তো নিজেই ভীষণ দুর্বল! প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত!!
তবু আমি শুনলাম আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন:
-আমাকে একটু অনুমতি দেবে দোহন করার?
উম্মে মা'বাদ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন:
-যদি তোমার মনে হয় ওর দুধ আছে তবে দোহন করো!'

আমি যখন শুনলাম উম্মে মা'বাদ অনুমতি দিয়েছেন, আমার আনন্দের কোনো সীমা রইলো না! আমি আবার 'ম্যাঁ-ম্যাঁ' বলে চীৎকার (না হর্ষধ্বনি?) করে উঠলাম! দুধ আমার ওলানে আছে কি নেই— সে বড় কথা নয়। আমি-যে আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতের ছোঁয়া ও পরশ পেতে যাচ্ছি, সে-ই ভাগ্য! এদিকে উম্মে মা'বাদ নবীজীর আগ্রহের কারণে অনুমতি দিলেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এক কাতরা দুধও আমার ওলান থেকে বের হবে না! তবু তিনি অনুমতি দিলেন! না দিয়ে পারলেন না! প্রার্থীর মুখের উপর 'না' বলে দেওয়া তার ধাঁচেই ছিলো না। তার তাঁবুতে এসে কেউ কিছু চাইবে আর তিনি 'না' করে দেবেন, সে কেমন করে হয়?

✵ ✵ ✵

তাঁর বরকতপূর্ণ শ্রেষ্ঠ হাত এইমাত্র আমার ওলানকে স্পর্শ করলো! আর মুখে তখন উচ্চারিত হলো—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهَا فِيْ عَنْـــزَتِـــهَا

হে আল্লাহ! তার বকরীতে বরকত দান করো!

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম!
বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হলো,
এতো দুধও লুকিয়েছিলো আমার ওলানে!
একটা পাত্র একেবারে টইটম্বুর!
দুধপূর্ণ পাত্রটা তিনি এগিয়ে দিলেন বিস্মিত উম্মে মা'বাদের দিকে, পান করতে!
উম্মে মা'বাদ কী আর পান করবেন!
বিস্ময়ের ঘোরই-যে তার কাটছে না!!
অবাক বিস্ময়ে পাত্রটির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি বড় বড় চোখে,
তাকিয়েই রইলেন! চোখের ভাষায় তিনি যেনো বলছিলেন:
অবিশ্বাস্য, কী করে ওর ওলানে দুধ এলো!
এবং এতো দুধ?
একেবারে চর্বি-বাওয়া?! ফেনিল-শুভ্র?!

উম্মে মা'বাদ সামান্য একটু পান করেই মুখ উঠিয়ে নিলেন, যদি শেষ হয়ে যায়! কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল তাকে আশ্বস্ত করলেন। আরো পান করতে বললেন। দুধে পূর্ণ আরেকটা পাত্র তাকে দেখালেন! এবার উম্মে মা'বাদ তার পাত্রের সবটুকু দুধ পান করলেন তৃপ্তিভরে। অপর পাত্রটি থেকে আবু বকর পান করলেন। সবার শেষে পান করলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। এরপর আবার তিনি আমার কাছে এলেন। আবার আমার ওলানে হাত রাখলেন। আবার অনেক দুধ দোহন করলেন। এ-দুধটুকু তিনি উম্মে মা'বাদের হাতে তুলে দিলেন। তারপর তার সহৃদয় মেহমানদারির শোকর আদায় করে বিদায় নিয়ে আবার পথচলা শুরু করলেন মদীনার দিকে!

✵ ✵ ✵

আবু মা'বাদ (উম্মে মা'বাদের স্বামী) সন্ধ্যে বেলায় ফিরে এলেন। ফিরলো দুবলা-পাতলা বকরীগুলোও। এদিকে ফিরেই স্ত্রীর হাতে পাত্রভরা দুধ দেখে তিনি তো অবাক! বললেন:
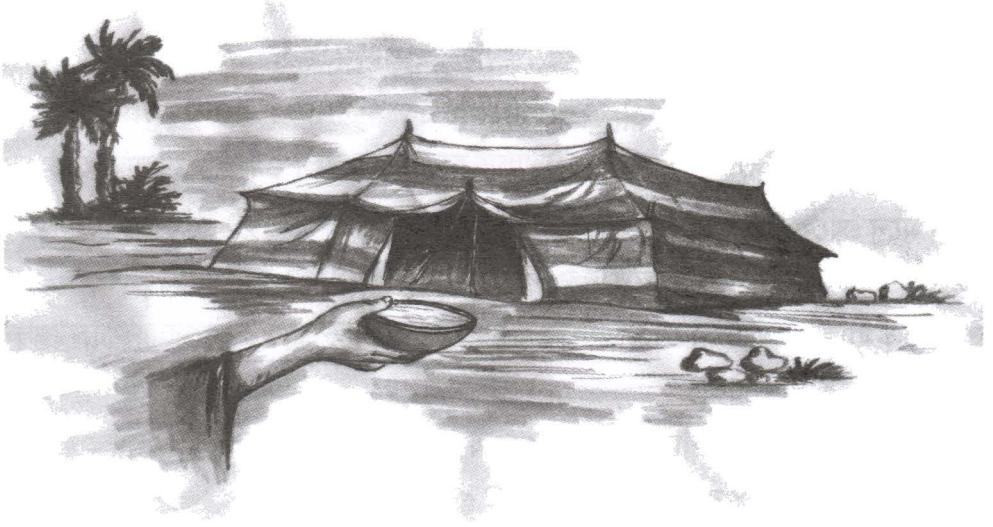
-দুধ! দুধ পেলে কোথায়? একটা দুধেল বকরীও তো তোমার কাছে রেখে যাই নি!
উম্মে মা'বাদ মুগ্ধতা ছড়ানো কণ্ঠে জবাব দিলেন:
-আমাদের তাঁবুতে এসেছিলেন এক বরকতময় ব্যক্তি! এ-সব তাঁরই বরকতের 'বৃষ্টি'!
উম্মে মা'বাদ এরপর সবকিছুই স্বামীকে বললেন। তার স্বামী বলে উঠলেন:
-আহা! মনে হচ্ছে এ-ব্যক্তিই সেই মুহাম্মদ! তাঁকেই কোরাইশ হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে। তাঁকে ওরা ধরতে চায়। তুমি আমাকে তাঁর একটা বর্ণনা দিতে পারো? দেখতে কেমন? আচরণ কেমন?

তাঁবুবাসিনী উম্মে মা'বাদ-এর 'কবিমনটা' যেনো এমনি একটা প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিলো! তাই মুহাম্মদের কথা নিখুঁত ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে তাকে একটুও বেগ পেতে হলো না—ভাবতে হলো না। এমনভাবে তিনি স্বামীকে শুনিয়ে গেলেন মুহাম্মদের কথা, যেনো তিনি চোখের সামনে মেলে-ধরা কোনো অলংকারসমৃদ্ধ হস্তলিপি পড়ছেন!
তিনি বললেন:
-তাঁর চেহারা নূর-ছাওয়া—আলোকোদ্ভাসিত!
মুখে লেগে ছিলো মৃদু হাসির মিষ্টি টুকরো!

কণ্ঠস্বর ভীষণ মনকাড়া, কথায় যেনো মধু ঝরে!
দেখতে না লম্বা না খাটো!
তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে মন চায় না—
কেবল তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে!
তখন মনে খেলে যায় অদ্ভুত মজার একটা শিহরণ!
সঙ্গীরা তাঁকে ভীষণ সম্মান করে!
তিনি ভদ্র মার্জিত অভিজাত!!!
মহান চরিত্রের অধিকারী!
দুধ দোহনের পর সবার পান করা যখন শেষ,
তাঁর পান করা তখন শুরু !! ..

আবু মা'বাদ পান করতে লাগলেন সেই বরকতময় হাতের দোহন-করা দুধ, মুহাম্মদী বরকতের প্রতি আসক্ত ও লালায়িত হয়ে। শুধু দুধে নয়, তাঁবু ও তার আশপাশ—সর্বত্রই যেনো মুহাম্মদ রেখে গেছেন তাঁর বরকতের ছাপ! আবু মা'বাদ আবেগ-প্লাবিত কণ্ঠে বললেন:

-ইনিই আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর কথাই আমরা শুনেছি। আহা! তাঁর সাথে যদি আমার দেখাটা হয়ে যেতো! তাঁর মুখের একটু কথা যদি আমি শুনতে পারতাম! তাঁর সাথে যদি একটু কথা বলতে পারতাম! যদি তাঁর সাথে আমিও চলে যেতে পারতাম সেই সেখানে, যেখানে তিনি যাচ্ছেন! হায়! আমি যদি তাঁর হাতে ঈমান কবুল করতে পারতাম!

উম্মে মা'বাদ বললেন:

-তিনি তো হারিয়ে যাচ্ছেন না, যে কোনো সময় আপনি তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবেন! তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন!

* * *

আমি এতোক্ষণ নীরবেই তাঁদের কথা শুনছিলাম। নীরবতা ভেঙে আবু মা'বাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলতে চাইলাম। আবার বলে উঠলাম আমার ভাষায়— ম্যাঁ .. ম্যাঁ .. ম্যাঁ .. ম্যাঁ!

ফলটা ভালই হলো। আবু মা'বাদ উঠে আমার কাছে এলেন এবং আদর করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আর আবেগমথিত গলায় বলতে লাগলেন:

-আমাদের প্রিয় বকরী! তোমাকে অনে-ক ধন্যবাদ! তোমার কারণেই তো আমরা এক মহা মানবের পরশ পেলাম! তোমার মর্যাদা এখন অনেক উঁচু। মানুষ তোমাকে ভুলবে না। ইতিহাস তোমাকে ভুলবে না। আজ যা ঘটে গেলো এই তাঁবুকে ঘিরে .. আমাদেরকে ঘিরে .. বরং তোমাকে ঘিরে, তা কি কখনো ভোলা যায়?!

আবু মা'বাদের কথার উত্তরে আমি বলতে চাচ্ছিলাম:

মনিব! আমার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই!
আমি কেবল বিস্ময় ও মুগ্ধতা নিয়ে
স-ব দেখে গেছি!
শ্রেষ্ঠত্ব যা, স-ব তাঁরই!
সেই বরকতময় হাতের,
যা আমাকে স্পর্শ করেছে।
সেই হাতের মালিকের,
যিনি দু'আ করেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা কবুল করেছেন!
আমার ওলান পূর্ণ হয়ে গেলো দুধে!

✵ ✵ ✵

আমি ভীষণ গর্ব অনুভব করি। কেননা আমার দুধ পান করেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। তাও আবার এক গুরুত্বপূর্ণ সফরে। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে। যে হিজরত বদলে দিয়েছিলো সবকিছু। মুসলমানদের সংখ্যা এতো বাড়িয়ে দিয়েছিলো যে, যখন আমি তাঁদেরকে দীর্ঘ দিন পর মক্কায় ফিরে যেতে দেখলাম বিজয়ীর বেশে, ইসলামের মহান পতাকা হাতে, তখন আমি তাঁদের সংখ্যা গোনে গোনে শেষ করতে পারি নি! কেবল তাকিয়েছিলাম অবাক বিস্ময়ে এবং আনন্দ-বিগলিত চিত্তে। আর বারবার ফিরে যাচ্ছিলাম আমার সেই মধুময় স্মৃতির কাছে! আহা! এই স্মৃতিটিই তো এখন আমার সবচে' বড় ধন!

আমি 'কাসওয়া'

আমিও আমার স্বামীর মতো মরু-জাহাজ। মরুভূমিতে ছুটে বেড়াই ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন পিপাসাহীন। এভাবে অনায়াসে আমি পাড়ি দিতে পারি— দূরের, অ-নেক দূরের পথ। আমি থাকতাম মক্কাতেই, যখন মক্কায় সবাইকে আল্লাহ্‌র রাসূল ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আমার মালিক ছিলেন হযরত আবু বকর। আরো বিস্তারিত বলছি, শোনো—

কাফেররা অনেক গোপনে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চক্রান্ত করলো। নবীজী ওহীর মাধ্যমে যথা সময়ে ওদের ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেললেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে মদীনা হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন ভর দুপুরে তিনি আবু বকরের গৃহে এলেন, তাঁকে হিজরতের কথা জানাতে। এ দিকে আমার মনিব পূর্ব থেকেই হিজরতের জন্যে, বিশেষ করে আল্লাহ্‌র নবীর সফরসঙ্গী হওয়ার আশায় অধীর অপেক্ষায় সময় পার করছিলেন। তাই আল্লাহ্‌র রাসূলের মুখে যখন তিনি জানতে পারলেন আজই হিজরত হবে এবং তিনি নবীজীর হিজরত-সঙ্গী হবেন, তখন আমার মনিব খুশিতে কেঁদেই ফেললেন! আম্মাজান আয়েশা তাঁর এ-কান্না দেখে ভীষণ আলোড়িত হলেন। পরবর্তীতে হিজরতের হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'আমি আনন্দের আতিশয্যে আর কাউকে কাঁদতে দেখি নি— আমার বাবা ছাড়া!'

তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলকে জানালেন যে, হিজরতের জন্যে তিনি দু'টি উটনী ঠিক করে রেখেছেন— আমি এবং আমার বোন। আমাকে পেশ করলেন আল্লাহ্‌র রাসূলের

জন্যে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল বিনামূল্যে আমাকে নিতে রাজি হলেন না। অগত্যা মূল্যের বিনিময়েই তিনি আমাকে আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্যে পেশ করলেন।

আল্লাহ্‌র রাসূলের বাহন হতে যাচ্ছি আমি মক্কা থেকে মদীনা হিজরতের পুণ্য সফরে— এ আনন্দে আমি রীতিমত আটখানা! যাই হোক; আল্লাহ্‌র রাসূল সে বৈঠকেই আবু বকরকে নিয়ে হিজরতের পূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এভাবে—

১. কখন বের হবেন,

২. কীভাবে বের হবেন,

৩. কোত্থেকে বের হবেন,

৪. কোন্ পথে বের হবেন,

৫. কোথায় গিয়ে প্রথমে আশ্রয় নেবেন,

৬. আশ্রয়কালীন সময়ে কে তাঁদেরকে মক্কার অবস্থা জানাবে,

৭. গারে সাওরে কে তাঁদের জন্যে খাবার নিয়ে যাবে,

৮. তারপর সেখান থেকে কখন মদীনায় রওয়ানা হবেন,

৯. আবু বকর ছাড়া আর কে সঙ্গে থাকবে,

১০. কে তুলনামূলক ঝুঁকিমুক্ত পথে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাবে— এ সব কিছুই তাঁরা এক সঙ্গে বসে ঠিক করে ফেললেন। কী সুন্দর নিখুঁত পরিকল্পনা!

✺ ✺ ✺

নির্ধারিত দিনে আমাকে এবং আমার বোনকে নিয়ে গারে সাওরে হাজির হলেন পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত। তখন সময়টা ছিলো রাতের শেষ প্রহর। আল্লাহ্‌র রাসূল আরোহণ করলেন আমার পিঠে আর আবু বকর আরোহণ করলেন আমার বোনের পিঠে। আমরা পথচলা শুরু করলাম মদীনার দিকে। আমরা চলতে লাগলাম ক্লান্তিহীন। প্রচণ্ড গরমেও আমার কোনো কষ্ট হচ্ছিলো না। কতো পাহাড়-উপত্যকা আমরা মাড়িয়ে যাচ্ছি, কতো মরুভূমি ও বালিয়াড়ি আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি, তবু ক্লান্তি আমাকে কিংবা আমার বোনকে স্পর্শ করছে না। বরং আমরা পথ চলছিলাম আনন্দভরে, গর্বভরে। ছুটে ছুটে .. দৌড়ে দৌড়ে। আর এমন তো হবেই! আমার পিঠে-যে বসে আছেন শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর

আমার বোনের পিঠে শ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকর রা.! আমরা বাহন হয়েছি শ্রেষ্ঠ সফরের শ্রেষ্ঠ আরোহীর! শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতির! তাই আমরাও শ্রেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ আরোহীর পরশে শ্রেষ্ঠ বাহন! ফুলের গন্ধে মাটির মতন!

এই পুণ্য সফরে আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের অনেক মু'জিযা দেখেছি। আমি দেখেছি কবুতর ও মাকড়সাকে গারে সাওরের মুখে ঝুঁকি নিতে— রাসূলকে এবং রাসূলের বন্ধুকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে! গারে সাওরের মুখে কবুতর আর মাকড়সাকে নিজেদের 'কাজে' ব্যস্ত না দেখলে ওরা—কাফির মুশরিকরা— কি এতো সহজে ফিরে যেতো? গুহাটা তো একবার হলেও একটু উঁকি দিয়ে দেখতো! আমি আরো দেখেছি কেমন করে সুরাকা বিন মালিক আল্লাহ্‌র রাসূলের পিছু নিয়েছিলো, শত উটের পুরস্কার-উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে। এগিয়ে আসছে কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল হাত দিয়ে ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুরাকার ঘোড়ার পা' মাটিতে দেবে গেলো! এমন হলো একবার দুইবার তিনবার! আমি দেখেছি উম্মে মা'বাদের সেই বকরী। কী দুর্বল ছিলো, ঠিকমত দাঁড়াতেই পারতো না! দুধ দেওয়া যার জন্যে ছিলো অসম্ভব, তার ওলানই যখন আল্লাহ্‌র রাসূলের মুবারক হাতের স্পর্শ পেলো, তখন দুধের যেনো নহর বয়ে গেলো! এক পাত্র উম্মে মা'বাদ পান করলেন। আরেক পাত্র তার স্বামী পান করলেন। আরেক পাত্র পান করলেন শ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহাবী।

এ সব কিছুই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছিলো। আরো প্রমাণ করছিলো যে, আল্লাহ আছেন তাঁর সাথে। কাফেররা কিছুতেই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলি; আমি এ-পথ এর আগে বহুবার মাড়িয়েছি। অন্যান্য বার এ-পথ মাড়াতে আমার সময় লাগতো ১১ দিন, তাও দিনে-রাতে অবিশ্রান্ত পথ চলে। আর এ-সফরে আমার সময় লেগেছে মাত্র ৮ দিন, তাও শুধু রাতে চলে। দিনের বেলায় তো দুশমনের ভয়ে লুকিয়েই থাকতে হতো আমাদের! দুশমন সর্বত্রই ওঁত পেতে বসে ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ-মহান সফরে আমরা নিরাপদেই মঞ্জিলে পৌঁছে গেলাম, আল-হামদুলিল্লাহ! সবই আল্লাহর ইচ্ছা!

আমরা একদম কাছে চলে এলাম ইয়াসরিবের। দূর থেকে চোখে পড়ছিলো খেজুর বাগানের সবুজাভ দৃশ্য। আমি খুশিতে মাতোয়ারা। আমার বোন বিভোর আত্মাহারা। কেননা আল্লাহ্র রাসূল এখন শত্রুমুক্ত। আমি আপন মনে কথা বলতে লাগলাম— আচ্ছা, আমরা তো এখন মদীনার দ্বারপ্রান্তে। একটু পরই প্রবেশ করবো মদীনায়। মদীনাবাসী আল্লাহ্র রাসূলকে কেমন করে স্বাগত জানাবে? এর মধ্যে তো রাসূলের ইয়াসরিবের উদ্দেশে মক্কা ছাড়ার কথা নিশ্চয়ই তারা জেনে গেছে!
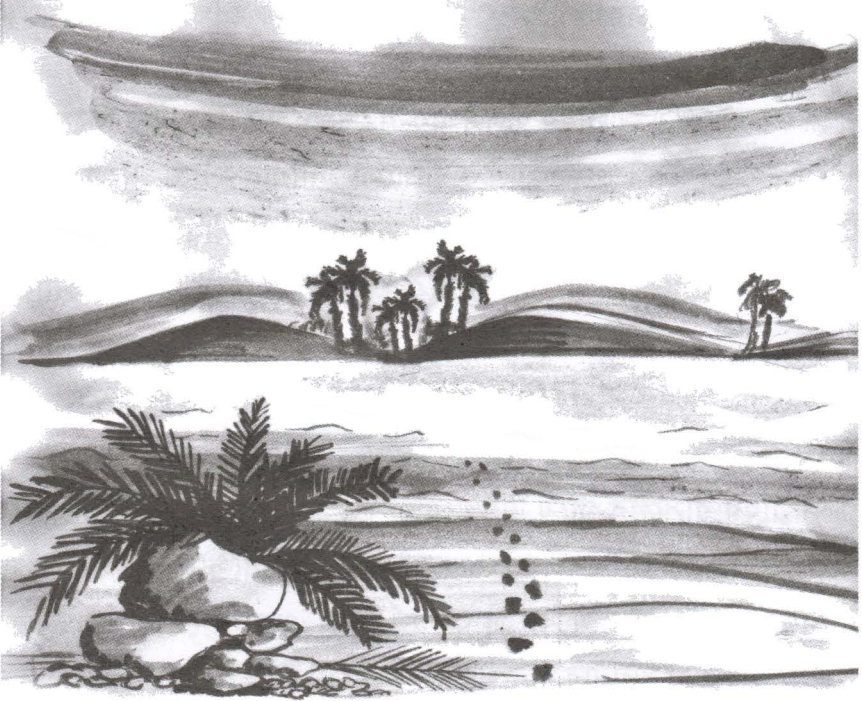
সূর্যটা তখন ঠিক মধ্য আকাশে। আমরা ইয়াসরিবের আরো কাছে চলে এসেছি। হঠাৎ আমার কানে এলো একটা হর্ষধ্বনি:

-ওই যে তোমাদের প্রতীক্ষিত মানুষটি এসে গেছেন! তোমাদের ভাগ্য-দুয়ার খুলে গেছে!

পথ কমতে লাগলো!

আওয়াজ ও গুঞ্জরন বাড়তে লাগলো!

সবাই আল্লাহু আকবার .. আল্লাহু আকবার বলে আকাশের শূন্যতায়—ইথারে ইথারে ভাসিয়ে দিতে লাগলো তাকবীর-ধ্বনির তরঙ্গমালা!

আমার মনে হচ্ছিলো—

এ নিনাদে জমিনও কাঁপছে!

আরো মনে হলে—

সারা দুনিয়াই যেনো ইয়াসরিববাসীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে—

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার!

✵ ✵ ✵

আমার উপর থেকে নেমে আল্লাহ্‌র রাসূল একটা খেজুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন, আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে। ছুটে আসতে লাগলো মদীনার মানুষ, দলে দলে। এর আগে অনেকেই নবীজীকে দেখে নি। তবুও তাঁর ভালোবাসায় হৃদয়ে তাদের বান ডেকে গেলো। মরুর বুকে যেন ঝরনা বয়ে গেলো। স-ব এসে এক মোহনায় মিলে গেলো!

এক মহিলা পাশের আরেক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

-এই, কোন্‌জন নবীজীরে! কোন্‌জন আবু বকর?!

একটু পর আল্লাহ্‌র রাসূলের গায়ে এসে রোদ পড়লে আবু বকর যখন তাঁকে ছায়া দিতে রুমাল মেলে ধরলেন, তখন তাঁরা বুঝলেন— কে নবীজী আর কে আবু বকর! শ্রেষ্ঠ নবী আর শ্রেষ্ঠ উম্মদের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! একজন থেকে আরেকজনকে আলাদা করতে তাই তো মদীনার মানুষের কষ্ট হয়েছে!

লোকেরা এসে তাঁকে সালাম দিতে লাগলো। সবাই তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলো উপদেশ দিতে। আলোর কথা বলতে। সত্যের কথা বলতে। তিনি তখন সবার মাঝে সালাম-এর আমল ছড়িয়ে দিতে বললেন। অন্যকে খাবার খাওয়াতে বললেন। একে অপরকে দান করতে বললেন। পরস্পরকে ভালোবাসতে বললেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নামাজ পড়তে বললেন এবং এ-সব পুণ্য কাজের সেঁতু ধরে সোজা জান্নাতে চলে যেতে বললেন!

✵ ✵ ✵

কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্‌র রাসূল আবার আমার পিঠে এসে বসলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখন তিনি আর আমার লাগাম ধরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না, লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন। এদিকে মদীনাবাসী আমাদেরকে উষ্ণ ভালোবাসায় ঘিরে রেখেছে। আমাদেরকে ওরা ঘিরে রেখেছে ভালোবাসার 'বেষ্টনী' দিয়ে! আমরা চলছি, ঐ বেষ্টনীও চলছে! কী অপূর্ব! অমন শোভাযাত্রা কে কোথায় কখন দেখেছে? একটু পরই ধ্বনিময় হয়ে উঠলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বাগত সঙ্গীতটা, একঝাঁক কচি কণ্ঠে! ওফ! দফ যোগে সেই স্বাগত সঙ্গীত শুনতে আমার কী-যে মজা লাগছিলো! তোমরাও শুনবে?

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع

'ঐ দেখো! 'সানিয়্যাতুল ওদা' থেকে
উদিত হয়েছে আমাদের আকাশে— পূর্ণিমার চাঁদ!
আল্লাহ্‌র পথের আহ্বানকারী যতোদিন আহ্বান করবে,
ততোদিন শুকরিয়া আদায় করা আমাদের মহান দায়িত্ব!
আমাদের মাঝে প্রেরিত হে মহান রাসূল!
আপনি এসেছেন এমন বিষয় নিয়ে,
যা আমাদেরকে অনুসরণ করতেই হবে!
আপনি এসেছেন, ধন্য করেছেন মদীনা,
হে শ্রেষ্ঠ আহ্বানকারী! স্বাগতম আপনাকে, সুস্বাগতম!

'শোভাযাত্রা' এগিয়ে চললো। আর আমি আনন্দাতিশয্যে বেশ হেলে-দোলে চলতে লাগলাম মদীনার নবী-প্রেমিকদের বেষ্টনীতে বেষ্টিত হয়ে।

আহা! কী ভালোবাসা!

কী মায়া মমতা! কী মানবতা! কী আতিথেয়তা!

ভালোবাসা যেনো সবার চোখ থেকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে!

আর সবার মুখের ঐ মৃদু হাসিটি!

তুলনা তার কী দিয়ে করি?

সবাই চায় 'আমার ঘরেই মেহমান হবেন আল্লাহ্‌র রাসূল'!

সে কি জোরালো আবেদন!

সে কি মিষ্টি কাড়াকাড়ি!

আমার 'কবিতা' বলতে ইচ্ছে করছে—

ভালোবাসার এ কর-কোমলে,

ছিঁড়ে যাবে কি মোর লাগামখানি!

ছেড়ে দাও না— বন্ধু!

জানো না বুঝি, আমি চলেছি আমার পায়ে, আমার অনিচ্ছায়!

হ্যাঁ .. থামতে হবে, সেও ঐ অনিচ্ছায়!

আজ নেই কোনো ইচ্ছে— আসমানের ইচ্ছে ছাড়া!

সব ইচ্ছের মোহনা আজ শুধু ঐ ইচ্ছে!

✷ ✷ ✷

আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলাম—

মক্কা আর মদীনার কণ্ঠে এতো বৈপরিত্ব কেনো?

'উষ্ণতায়' উষ্ণতায় এতো তফাত কেনো?

মানুষে মানুষে এতো ব্যবধান কেনো?

মক্কা থেকে কোন্ অবস্থায় বের হয়েছি?

ধরো মারো কাটো শেষ করে দাও!

আর এখানে! কী মিষ্টি ঝগড়া—

-এসো না হে রাসূল! আমার দুয়ারে রাখো না পা!
-না, তা কেনো? আমাদের কাছে থাকবেন রাসূল!
-মানে? আমরা তবে কী দোষ করলাম! ছাড়বো না তাঁকে! উটনীর লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাবো আমার ঘরে!
নবীজী এই মিষ্টি ঝগড়ায়—এই আন্তরিকতায় সীমাহীন আপ্লুত হলেন। ছলোছলো ঝরনার মতো প্রবাহিত হলেন। বললেন:
-ছেড়ে দাও না তোমরা উটনীটিকে, তাকে যে বলে দেয়া হয়েছে (কোথায় গিয়ে থামতে হবে)!

আশ্চর্য! আমি আসলেই নিজের ইচ্ছায় পথ চলছিলাম না! চলতে পারছিলাম না! কী যেনো আমাকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! আমি আমার পায়ের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলাম না! হ্যাঁ, এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একটা জায়গায় এসে মনে হলো এখানেই থামতে হবে! এখানেই বিশ্রাম! নাহ! জায়গাটা অতিক্রম করে যাওয়া যাচ্ছে না! কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না! আমি বসে গেলাম, বসে যেতে বাধ্য হলাম!
আল্লাহ্‌র রাসূল নীচে নেমে জানতে চাইলেন:
-এ জায়গাটা কার?
সবাই জানালো:
-দুই এতিমের!
সেখানে আল্লাহ্‌র রাসূল মসজিদ নির্মাণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন ঐ এতিম বালকদ্বয় বিনা মূল্যে তাঁকে জায়গাটা উপহার দিতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল মূল্য পরিশোধ করেই জায়গাটি কিনলেন। এরপর তিনি গিয়ে উঠলেন পাশের গৃহে! আবু আইয়ূব আনসারীর গৃহে! ভাগ্যবান এক সাহাবীর গৃহে! আল্লাহ্‌র মনোনীত করা সাহাবীর মনোনীত গৃহে!
মক্কা থেকে হিজরত করে-আসা মানুষের প্রতি মদীনার মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা দেখে আমি অভিভূত! এ ভালোবাসার সুবাদেই তাঁদেরকে বলা হয় 'আনসার' আর এই ভালোবাসায় সিক্ত যাঁরা, ধন-সম্পদ-বিত্ত-বৈভব-স্বদেশ-ভিটে ফেলে এসেছেন

যাঁরা, তাঁরা হলেন মুহাজিরিন। আনসারদের ভালোবাসার ভাগ আমিও পেলাম। অনেক পেলাম। আমার বিশেষ সেবা-যত্নের জন্যে নবীজী আমাকে তুলে দিলেন প্রিয় সাহাবী আসআ'দ ইবনে যুরারাহ রা.-এর হাতে।
এমনিতে আমার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আমার শ্রেষ্ঠত্ব ঐ একটাই— আমি আল্লাহ্র রাসূলকে বহন করেছি, একটা ঐতিহাসিক সফরে। আমার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো, আমি আল্লাহ্র ইচ্ছায় পথ চলেছি। আল্লাহ্র ইচ্ছায় পথচলা বন্ধ করেছি। এ ছাড়া আমার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ্র রাসূলকে আমি আরো একাধিকবার বহন করেছি! সে আরেক কাহিনী! বিস্তারিত বলতে পারবো না, সময় নেই। এখন আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। ঘুমে চোখ বুজে বুজে আসছে। তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছোট্ট করে বলেই নিই! পরে আবার তোমরা যদি ঘুমোতে চলে যাও!
হ্যাঁ, হোদায়বিয়ার সন্ধির কথা তোমাদের মনে পড়ে? আমিই তখন তাঁর বাহন ছিলাম। সে সময় উমরা না করেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিলো। হোদায়বিয়ার কাহিনী নিয়ে একটু পরই হাজির হবে রিদওয়ান বৃক্ষ। তারপর আমিই ছিলাম তাঁর বাহন মক্কা বিজয়ের সময়ে। বিদায় হজ্বের সময়েও আমার মহান সওয়ারী ছিলেন নবীজী। নবীজীর ওফাতের পরও আমি বেঁচে ছিলাম অনেক দিন। কিন্তু প্রিয়হারানোর দুঃখ-জ্বালা বুকে নিয়ে। আপন হারানোর শোক-স্তব্ধতা চোখে নিয়ে। এ-সবে জ্বলতে জ্বলতেই অবশেষে আমি বিদায় নিয়েছিলাম হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে। মৃত্যু আমাকে ভাবায় নি। দুশ্চিন্তাগ্রস্তও করে নি। প্রিয় চলে গেছে যে পথে সে পথে কিসের আবার বেদনা? .. এবার তবে একটু ঘুমিয়ে নিই? ...

আমি 'বদর' বলছি

আমার নাম বদর—বদর কূপ। আমার অবস্থান মক্কা ও মদীনার মাঝে। পরিব্রাজক ও রাখালেরা আমার কাছে আসে পানির খোঁজে। এ-সব দেখে দেখেই আমার দিন কাটে। কখনো দেখা হয় রাখাল বন্ধুদের সাথে আবার কখনো দেখা হয় মুসাফির ভাইদের সঙ্গে। কিন্তু একদিন ঘটলো ব্যতিক্রম ঘটনা। ভোর হতেই দেখলাম সৈন্য সমাবেশ। আগে এসে সৈন্য সমাবেশ করলেন নবীজী ও সাহাবীরা এবং খুবই সুবিধাজনক স্থানে। আর পরে এসে সমাবেশ করলো কোরাইশ বাহিনী। না, ওদের জায়গাটা ভালো পড়ে নি। পানির কষ্ট হবে নিশ্চিত। আরেকটু বিস্তারিত বলি—

বদর যুদ্ধের নাম শুনেছো? সে-যুদ্ধের ইতিহাসটা কি পড়েছো? আমি এখন সে যুদ্ধের কথাই তোমাদেরকে বলবো।

আমার নামেই এ-যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে, সবাই বলে— বদর যুদ্ধ। এ-যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো ১৭ই রমজান দ্বিতীয় হিজরীতে। হিজরতের ঘটনাটা মক্কার কাফির মুশরিকদেরকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো। তাদের এই ক্ষোভকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো হিজরতের পর মদীনায় মুহাজিরদের কোনো রকম কষ্ট-ক্লেশের মুখোমুখি না হওয়াটা। আর এ ক্ষোভের মাত্রাটা আরো তীব্র করে তুলেছিলো আনসার-মুহাজির ভাই-ভাই সম্পর্ক, তাঁদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি, যা ছিলো নজিরবিহীন, অতুলনীয়। যেনো তাঁরা একে অপরের আপন ভাই! কিন্তু মুহাজিররা আনসারদের এ প্রাণঢালা ভালোবাসা, স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ ও আপ্লুত হলেও আনসারদের উপর তারা বোঝা হতে চাইলেন না কেউ। বরং স্বাধীনভাবে জীবন-জীবিকার একটা পথ ও উপায় বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা এবং সে

জন্যে সবাই চেষ্টাও করে যাচ্ছিলেন। না, সে জন্যে তাঁদেরকে বেশী বেগ পেতে হলো না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা যে যার মতো করে আয়-রোজগারের একটা পন্থা বের করে নিলেন।

মুহাজিররা সঙ্গে করে তেমন কিছুই নিয়ে আসতে পারেন নি। আর তা সম্ভবও ছিলো না। কেননা সবাইকেই কাফির মুশরিকদের চোখ এড়িয়ে কোনো রকমে মক্কা ত্যাগ করতে হয়েছে। রাতের আঁধারে। সঙ্গোপনে। এ জন্যেই প্রথম প্রথম মদীনায় এসে তাঁদেরকে একটু অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিলো। যদিও আনসারদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ-সঙ্কট সহজেই তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আনসাররা একেবারে নিজের ভাইয়ের মতো করে সবকিছুতেই তাঁদেরকে ভাগ দিয়েছিলেন। ফলে মুহাজিরদের অভাব আর অভাব থাকে নি। কোনো শূন্যতাই তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে নি। অথচ অপরদিকে মক্কায় পড়ে ছিলো মুহাজিরদের নিজস্ব সহায়-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি। সে সব এখন ভোগ করছে মক্কার কাফির মুশরিকরা। এ বিষয়টি তাঁদেরকে খুবই পীড়া দিতো। দেবারই কথা; কী করে এটা কল্পনা করা যায় যে তাঁদেরই সম্পদে ওরা ফুলে-ফেঁপে ওঠবে তারপর তাঁদের উপরই এসে হামলে পড়বে, যে কোনো মুহূর্তে! দিনে অথবা রাতে, জাঁকালো সমরায়োজন নিয়ে! না, এটা মেনে নেয়া যায় না, কিছুতেই না! তাই আক্রান্ত হওয়ার আগেই ওদেরকে রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন। এমন একটা সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম।
হ্যাঁ .. একদিন অমন একটা সুযোগ এসে গেলো। একেবারে হাতের কাছে। আরেকটু পরিস্কার করে বলছি।

একদিন নবীজীর কাছে সংবাদ এলো, আবু সুফিয়ান এক বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হয়েছেন এবং সে কাফেলা এখন মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে। নবীজী সাথে সাথে তা প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সুচতুর আবু সুফিয়ান তা সময় মতো জেনে ফেললেন এবং অন্য আরেকটি নিরাপদ পথে সিরিয়া পৌঁছে গেলেন। নবীজী হাল ছাড়লেন না। ফিরতি পথে আবু সুফিয়ানকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
সিরিয়ায় বেচা-কেনার পর্ব শেষ করে আবু সুফিয়ান বিপুল পণ্য-সামগ্রীসহ একদিন

মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সময় মতোই আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খবর পেয়ে গেলেন। বললেন:
-আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা এখন তোমাদের হাতের নাগালে। দ্রুত অগ্রসর হও। সম্ভবত আল্লাহ্ গণিমতের মাল হিসাবে তোমাদেরকে তা পাইয়ে দেবেন।

✷ ✷ ✷

লোকসংখ্যা তেমন নয়, মাত্র চল্লিশজন। কিন্তু সাথে রয়েছে বিপুল পরিমাণ পণ্য। আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে এ কাফেলাকে প্রতিহত করার নির্দেশ জারি হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে এ-জালিমরাই তাঁদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলো। আজ সময় হয়েছে সে সবের কিছুটা হলেও বদলা নেওয়ার। এ ছাড়া এটা তো জানা কথাই যে, এরা এইসব বাণিজ্যে রাজ্যের মুনাফা লুটে ইসলামের বিরুদ্ধেই তা ব্যবহার করবে! ঢাল-তলোয়ার কিনবে, উট-ঘোড়া কিনবে আরো কতো সমরোপকরণ কিনবে! তারপর সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে মদীনায়। শেষ করে দিতে মুসলমানকে, ইসলামকে। সে সুযোগ কেনো তাদেরকে দেওয়া হবে! সাপ ফুঁস করার আগেই .. ছোবল মারার আগেই বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে!

✷ ✷ ✷

আবু সুফিয়ানের কাফেলা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে— এমন খবরে কোরাইশ শিবিরে আগুন জ্বলে উঠলো। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি সীমাহীন ক্ষুব্ধ হলো। বিশেষ করে তারা যখন জানতে পারলো যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-প্রেরিত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রা. -এর নেতৃত্বে একটি ঝটিকা দল মক্কা ও তায়েফের মাঝে 'নাখলা' নামে একটি জায়গায় মুশরিকদের এক বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করে দু'জনকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে গেছে, আরেকজনকে হত্যা করেছে। এ-ঘটনা কোরাইশ শিবিরকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই তারা আবু সুফিয়ানের বিপদাক্রান্ত হওয়ার কথা শুনে আর দেরী করলো না, সাজসাজ রবে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। দেখতে দেখতে প্রস্তুত হয়ে গেলো এক হাজার যোদ্ধার বাহিনী। ১০০ ঘোড়া আর ৭০০ উটে সজ্জিত ছিলো সেই বাহিনী। এ ছাড়া অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তো আছেই। মুসলিম বাহিনী এ-খবর শুনে

জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। সংখ্যায় ছিলেন তাঁরা দুশমনের তিনভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ তিনশ' তেরজন। সাথে মাত্র দু'টি ঘোড়া।

মুসলিম বাহিনী আমার কাছে—বদর কূপের কাছে— আসার পূর্বেই আল্লাহ্‌র রাসূল আমার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে শিবির স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রিয় সাহাবী আলহুবাব ইবনুল মুনযির রা. তাঁকে আমার একদম কাছে এসে তাঁবু স্থাপনের পরামর্শ দিলেন, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে মুসলিম বাহিনী আমার পানি যতো ইচ্ছে পান করতে পারে আর কাফির মুশরিকরা তীব্র প্রয়োজনেও পানির ছিঁটে-ফোঁটাও না পায়। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-পরামর্শ খুব পছন্দ করলেন এবং আমার কাছে এসে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। হাউজে পানি আটকে রাখতে বললেন, নিজেরা পান করার জন্যে এবং ঘোড়া (সংখ্যা ২) ও উটকে (সংখ্যা ৭০) পান করানোর জন্যে।

কোরাইশ বাহিনী রণাঙ্গনে এসে পৌঁছলো বেশ হেলে-দোলে খোশ মেযাজে হামবড়া ভাব নিয়ে। আগেই বলেছি; ওদের সাথে ১০০ ঘোড়া আর ৭০০ উটের বহর। কিন্তু এসেই তারা হোঁচট খেলো, প্রথম হোঁচট। কেননা রণ-কৌশলে তারা হেরে গেছে। তারা এসে দেখলো মুসলিম বাহিনী তাদেরকে 'পানিতে মারা'র সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে। এতোটা পথ মাড়িয়ে এসে এ-অবস্থা দেখলে কার মাথা ঠিক থাকে? ওদের মাথাও ঠিক থাকলো না, আওলাঝাওলা হয়ে গেলো। ওদের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা পিপাসাটা হা করে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। বদরাগী এ-পিপাসার ভাবখানা যেনো এই— 'এই বেটারা! জলদি আমারে পানি দে, নইলে তোদের রক্ত খাবো!'

সুতরাং তারা পানির জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। একজন কসম করে বললো, সে নাকি আমার কোল পর্যন্ত আসবেই—পানি পান করবেই। অথবা মুসলিম বাহিনীর হাউজটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, যাতে ওরা পানির সুবিধা ভোগ করতে না পারে। কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হলো না, তার পথ রুখে দাঁড়ালেন নবী-পিতৃব্য (চাচা) মহাবীর

হামযা রা.! এখন কে কার ঘাড় মটকায়? মহাবীর হামযার এক আঘাতেই সেই 'বীরপুরুষের' 'বদর কূপের' পানি পানের শখ চিরতরে মিটে গেলো। দুনিয়া থেকে বিদায় হলো শেষ নবীর সাথে লড়তে-আসা এক অভিশপ্ত মূর্তিপূজারী। আমিও মুক্তি পেলাম এক দুর্ভাগাকে পানি পান করানোর লজ্জা থেকে।
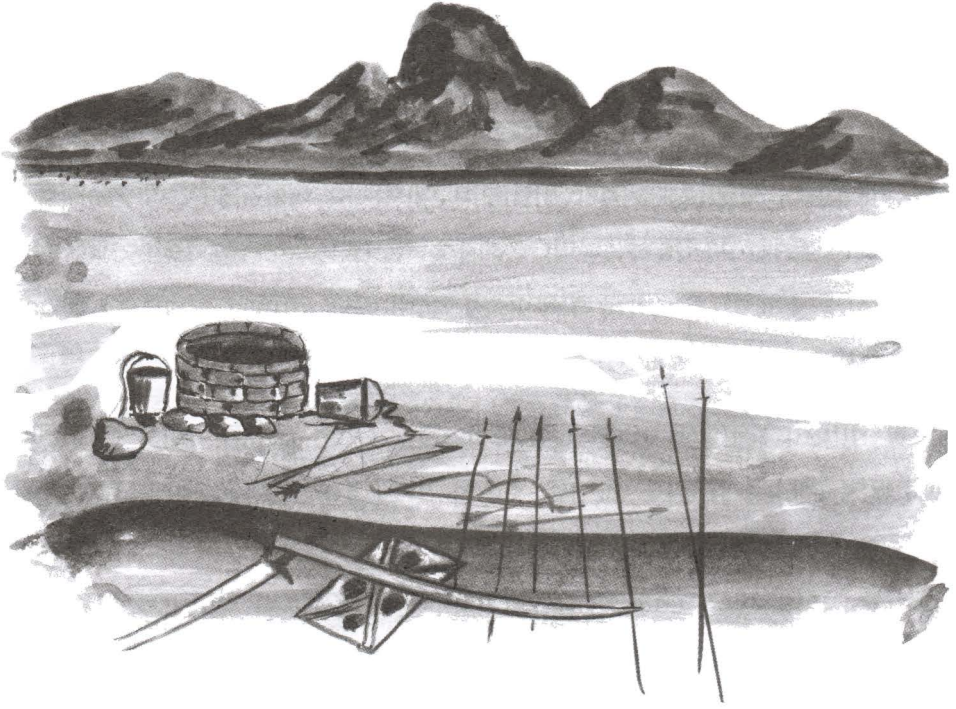
প্রাচীনকালে যুদ্ধের রেওয়াজ ছিলো, প্রথমে তা শুরু হতো এককভাবে। এ-দল থেকে একজন আর ও-দল থেকে একজন। এই একক যুদ্ধের পর শুরু হতো ব্যাপক যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধ। সম্মিলিত যুদ্ধ। এক পক্ষ আরেক পক্ষের কাতার ভেদ করে ঢুকে পড়তো ভিতরে, আরো ভিতরে। তারপর শুরু হয়ে যেতো মার-মার কাট-কাট অবস্থা। এখানেও হলো তাই। প্রথমে শুরু হলো একক লড়াই। হযরত হামযা রা.-এর আঘাতে ঐ লোকটা শেষ হয়ে গেলো, তখন ওদিক থেকে ছুটে এলো ওতবা—তায়েফের সেই আঙুর বাগানের মালিক। এগিয়ে এলো তার ভাই শায়বাও।

এসেই শুরু করে দিলো হাঁক-ডাক— কে আছো, সাহস থাকলে এসো লড়তে! তখন মদীনাবাসী আনসারদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এগিয়ে গেলে তারা লড়তে অস্বীকার করে বললো:
-না, তোমাদের সাথে আমরা লড়বো না! লড়াই হবে সমানে সমানে—কোরাইশে কোরাইশে! তখন এগিয়ে গেলেন হামযার পর হযরত আলী ও উবায়দাহ ইবনে হারিস। তাঁরা দু'জনও মহাবীর হামযার মতো সফল হলেন। তখন আবু জেহেল বলে উঠলো:
-এক সঙ্গে হামলা করো হে মক্কাবাসী!

এভাবেই আগে আক্রমণ শুরু করলো মুশরিক বাহিনী। আল্লাহ্র রাসূল নিষেধ করে দিয়েছিলেন, যেনো মুসলিম বাহিনী আগে হামলা না করে। বরং দুশমন হামলা শুরু করলেই জওয়াবী হামলা শুরু হবে। তাই হলো। দুশমনের সম্মিলিত হামলার সাথে সাথে জানবায মুসলিম ফওজ প্রতিরোধ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত্রু শিবিরের কাতার ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন তাঁরা। ঢাল-তলোয়ারের আওয়াজ আর 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনির মিশেলে সৃষ্টি হলো 'শহিদী-আনন্দের' অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা! সবার মন যেনো ছড়া কেটে কেটে বলছিলো—
মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী ..
চলো চলো যুদ্ধ করি!
কা'বার রবের শপথ ..
জান্নাতই আমার পথ!

লড়াই আরো তীব্র হলো। হযরত আবু বকর একটু অস্বস্তিতেই পড়ে গেলেন। কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা আর অস্ত্রবল-যে অনে-ক! আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বললেন দু'আ করতে আল্লাহ্র কাছে, আসমানের সাহায্য চেয়ে। তখন হাত ওঠালেন নবীজী—
ইয়া আল্লাহ! ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম! হে চিরঞ্জীব চিরন্তন! ...
একটু পরই আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর এবং অন্য সাহাবীদেরকে এই সুসংবাদ শোনালেন যে, বিজয় হবে মুসলমানদেরই!

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ-ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম বাহিনীর মনোবল আরো অনেক বেড়ে গেলো। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আল্লাহু আকবার তাকবীর দিতে দিতে তাঁরা দুশমনের কাতারে ঢুকে পড়ে প্রাণপণ লড়তে লাগলেন। আল্লাহ্‌র নবী সবাইকে বীরত্বের সাথে লড়ে যেতে উৎসাহ দিতে লাগলেন। সবাইকে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন—
গাযী যারা বিজয়ী তারা,
শহীদ যারা জান্নাতী তারা!

এক সাহাবীর হাতে কিছু খেজুর ছিলো। আল্লাহ্‌র রাসূলের ঘোষণায় উদ্দীপিত হয়ে তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন:
-জান্নাতের যাত্রা বিলম্বিত করার কোনো মানে হয়?!
দুশমনের উপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লড়তে লড়তে-মারতে মারতে অবশেষে পৌঁছে গেলেন তিনি জান্নাতের ঠিকানায়—সবুজ পাখির দেশে!

এক অসম যুদ্ধ, একদিকে এক হাজার। তাও সশস্ত্র। আরেক দিকে মাত্র ৩১৩ জন। যাদের নেই ওদের মতো অস্ত্রবল। নেই ওদের মতো বিশেষ যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা। একদিকে আছে অস্ত্রবল ও জনবল কিন্তু ওরা বাতিল। আরেকদিকে নেই তেমন অস্ত্রবল ও জনবল কিন্তু তাদের সাথে আছে হক, ঈমান ও বীরত্ব। কারা তাহলে বিজয়ী হবে? শেষ বেলায় কাদের আকাশে বিজয়ের রাঙা রবি লালিমা ছড়াবে?
কেউ যদি সেদিনের এই অসম যুদ্ধটা প্রত্যক্ষ করতো, যেমন আমি —বদর কূপ— করেছি, তাহলে অবশ্যই সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতো! সবাই তো এটাই জানে যে কোরাইশ বীর-বাহাদুরীতে সেরা, যুদ্ধে পাকা। কিন্তু সেই তারাই-যে আমার চোখের সামনে কুপোকাত হয়ে এখন পালানোর পথ খুঁজছে! লাশের পর লাশ ফেলে! যে লাশের সারিতে রক্তে-মাটিতে একাকার হয়ে পড়ে আছে ওদের সেনাপতি খোদ আবু জেহেলের লাশটাও! না, ওরা আর ময়দানে টিকতে পারলো না। আমার পাশ ঘেঁষেই মক্কার দিকে পালিয়ে গেলো! সত্তরটা মৃত লাশের পাশাপাশি আরো সত্তরটা জীবন্ত লাশ পেছনে ফেলে!

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে ফিরে এলো মুসলিম বাহিনী মদীনায়, বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে। কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নুইয়ে। ১৪জন বীর শহীদকে আমার পাশে সমাহিত করে। শহীদ বলছি আমি তাঁদেরকে, মৃত বলছি না। কেনো বলবো, তাঁরা মৃত?! তাঁরা বরং শহীদ, আল্লাহ্‌র কাছে চিরজীবন্ত! এমনকি আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তাঁদের জন্যে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার অফুরান আয়োজন!

এ-বিজয় ছিলো ইতিহাসের সেরা বিজয়।
এ-বিজয় ছিলো আল্লাহ্‌র নবীর এক শ্রেষ্ঠ মু'জিযা।
এ-বিজয় আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতার এক ঝলমলে প্রকাশ।
এ-বিজয় সব সময় বাতিলকে ভাবিয়ে তোলে আর হকপন্থীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

পরে যখন নবীজী মদীনায় এসে পৌঁছলেন বিজয়ীর বেশে, সারা মদীনা আনন্দে ভাসতে ভাসতে তাঁকে স্বাগত জানালো। তাঁর প্রতি তখন অনেকেই ঈমান আনলো। তারা ঈমান আনলো এ-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে যে, মাত্র ৩১৩ জনের বল নিয়ে যে বাহিনী ১০০০ জনের বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে, এক রকম অস্ত্রবল ছাড়াই, সে বাহিনী নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত ও সমর্থনপুষ্ট!

সে বাহিনীর বিশ্বাসই সেরা বিশ্বাস।

তাঁদের আক্বিদাই অনুসরণীয় আক্বিদা।

তাঁদের আদর্শই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

তাঁদের আদর্শকেই আকড়ে ধরে নির্দ্বিধ কণ্ঠে উচ্চারণ করা যায়—

এখন থেকে আমিও তোমাদের একজন!

আমিও এখন মুসলমান!!

আমিও এখন লড়বো সত্যের পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে!!

✹ ✹ ✹

কয়েদীদের সাথে ভীষণ কোমল আচরণ করলেন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অবস্থা ভেদে ১০০০ থেকে ৪০০০ হাজার দিরহাম মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি একেকজনকে ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিলেন। কেউ কেউ নির্ধারিত মুক্তিপণ দিতে পারলো না। তাদেরকেও আল্লাহ্‌র রাসূল আটকে রাখলেন না, মদীনার দশজন মুসলমানকে পড়ালেখা শিখিয়ে দেয়ার শর্তে মুক্তি দেওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন।

✹ ✹ ✹

মুসলিম বাহিনী সর্ব প্রথম লড়াইয়ে সর্ব প্রথম বিজয়টা অর্জন করেছিলো আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েই— এ কথা ভাবতে আমার ভীষণ গর্ব হয়। আরো গর্ব হয় এই ভেবে যে, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আমার কথা উল্লেখ করেছেন! সত্যি, এ এক মহা সৌভাগ্য! অথচ আমি মরুপথের এক ছোট্ট কূপ। মক্কা-মদীনার পথে প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিলাম। কারো পানির প্রয়োজন হলেই শুধু আমার কাছে আসতো। নইলে মরুচারীরা কখনো আমার দিকে তাকাতো, কখনো তাকাতো না। কুরআনে বিবৃত হই— সে ভাগ্য আমার কই!

আল্লাহ্‌র কী অসীম দয়া!
আমাকে তুলে নিলেন মাটি থেকে আকাশে!
সসীম থেকে অসীমে!
'আঁধার' থেকে আলোয়!
এ-সৌভাগ্য আমি রাখি কোথায়?
ইসলামের ইতিহাসে হক ও বাতিলের প্রথম লড়াইয়ের আমি এক নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম।
আজ বদর মানেই—
হকের বিজয় আর বাতিলের পরাজয়।
আজ বদর মানেই—
ঈমান ও বীরত্বের চিরন্তন বিজয়,
হোক তা অস্ত্রবল কিংবা জনবলে দুর্বল।
আজ বদর মানেই—
মিথ্যা ও কাপুরুষতার পরাজয়।
এ-পরাজয় বাতিলের ললাট-লিখন, হোক তা যতোই অস্ত্রসজ্জিত, আধুনিক সমরোপকরণে সুসমৃদ্ধ।
হে দুনিয়ার মুসলমান!
হে আগামী দিনের ছোট ছোট সেনাপতিরা!
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে ওঠো:
সত্য চির ভাস্বর! মিথ্যা চিরঅপসৃত!

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

'বস্তুত: আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।'
-সূরা আল-ইমরান

আমি ওহুদ পাহাড়

আমার নাম ওহুদ। আমি মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। তৃতীয় হিজরীতে অর্থাৎ বদর যুদ্ধের এক বছর পরে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার কাছে এসে জড়ো হচ্ছে কোরাইশ বাহিনী। সংখ্যায় তারা অনেক। তিন হাজার। দু'শ ঘোড়সওয়ার। আরো দু'শ দুর্ধর্ষ বর্মধারী। এরা এসেছে বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে। মদীনার উপকণ্ঠে চরে বেড়াচ্ছে ওদের ঘোড়া ও উটের পাল। একদল নারীকেও তাদের সাথে দেখা যাচ্ছে। কবিতা বলে বলে আর গান গেয়ে গেয়ে পুরুষদেরকে যুদ্ধ-মাতাল করে তোলার জন্যে এরা এসেছে।
আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এক হাজার সৈনিক নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে বের হয়েছেন। বদরের মতো এখানেও সৈন্য কম। অস্ত্র কম। বর্মধারী সৈন্যের সংখ্যা মাত্র একশ'। ঘোড়সওয়ার মাত্র দু'জন।

আমি ভীষণ বিস্মিত হলাম মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে একদল ক্ষুদে সৈনিক দেখে। একজন তো বেশ ছোট। তাকে বাদ দেয়ারই চিন্তা করা হলো। কিন্তু বাদ না-পড়তে সে একেবারে মরিয়া। আঙুলের মাথায় ভর দিয়ে ও নিজের 'উচ্চতা'র প্রমাণ দিচ্ছে! আরেক পিচ্চি তো যুদ্ধে যেতে আরো মরিয়া! নিজের সঙ্গি যাচ্ছে আর সে বাদ পড়বে— তা মানতে ও একেবারেই নারাজ! ওর স্পষ্ট বক্তব্য: ও গেলে আমিও যাবো! কেনো যাবো না? আমাদের দু'জনের মধ্যে লড়াই হলে আমি ওকে ঠিকই হারিয়ে দেবো!

অবশেষে দু'জনের মাঝে লড়াইও হলো, বিস্ময়কর লড়াই! যুদ্ধে যাওয়ার যুদ্ধ!! সত্যি সত্যি সে জিতে গেলো! আশ্চর্য! যার হারার কথা ছিলো সে হারলো না! যার জিতার কথা ছিলো সে জিতলো না! আসলে কেউ হারে নি, যুদ্ধে যেতে দু'জনই জিতেছে! কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে, ওদের মাঝে কি কোনো চুক্তি হয়েছিলো? যুদ্ধের আগে যুদ্ধে যেতে ঐ যে দু'জনের যুদ্ধটা, তার আগে দু'জনের মাঝে ফিসফিস যে-কানাকানিটা, সেটা কী নিয়ে ছিলো? হার-জিতের রহস্যটা কি তবে ঐ কানাকানিতেই লুকিয়েছিলো!

আমি আরো বিস্মিত হয়েছি বৃদ্ধ কিছু মানুষকে শরীক হতে দেখে! অথচ এটা তাঁদের যুদ্ধে যাওয়ার বয়স নয়! যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়টা তাঁরা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছেন! তবু কেনো তাঁরা?

কী আশ্চর্য!

যুদ্ধে না গেলে কে তাঁদেরকে কী বলতো?

আসলে তাঁরা কারো বলা-কওয়ার ভয়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন— এমনটা নয়, তাঁরা যুদ্ধে যাচ্ছেন লড়ে-লড়ে শহীদ হতে!

শহীদ হয়ে-হয়ে জান্নাতে চলে যেতে!

জান্নাতের পথটাকে আরো অনেক অনে-ক ছোট্ট করে ফেলতে!

একটা লাফ দিলেই যেখানে জান্নাতে চলে যাওয়া যাচ্ছে সেখানে হাত-পা গুটিয়ে কেনো তাঁরা বার্ধক্যের অজুহাতে ঘরে বসে বসে কালক্ষেপণ করবেন?

জান্নাতের সফরকে বিলম্বিত করবেন?

বুড়োদের জন্যে আগে আগে জান্নাতে যেতে বুঝি মানা!

আহা! কী সুন্দর আমাদের সোনালী যুগের সেই সোনালী ইতিহাস! জিহাদে যেতে ছোটরাও প্রতিযোগিতা করে! বুড়োরাও ঘরে বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ করে! যে জাতির ছোট-বুড়োরা এমন, সে জাতিকে কে হারাতে পারে?!

✺ ✺ ✺

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা এবার বদরের চেয়ে বেশী হলেও কোরাইশ বাহিনীর তুলনায় ঐ তিন ভাগের এক ভাগই। এদিকে এক হাজার ওদিকে তিন হাজার। এই এক হাজারো আবার ময়দান পর্যন্ত আসতে-না-আসতেই হয়ে গেলো সাতশ'। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই খোঁড়া অজুহাত তোলে সদলবলে মদীনায় ফিরে গিয়েছিলো। কিন্তু মুনাফিকরা মুনাফেকি করলেও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরলো না। হতাশা দানা বাঁধলো না। উল্টো খড়কুটো ভেসে যাওয়াতে তাঁরা বরং খুশীই, আরো বলীয়ান। আরো মরিয়া। বীরত্বের রাঙা আবীর শোভা ছড়াচ্ছে তাঁদের চোখে-মুখে সকাল বেলার রাঙা রবির মতো!

আল্লাহ্‌র নবী একটা উঁচু জায়গা বেছে নিলেন যুদ্ধ-পরিচালনার সুবিধের জন্যে। আমি ওহুদ পাহাড় দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তাঁর পেছনে— তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে। আমার মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে। এদিকটা দিয়ে দুশমন ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে যে-কোনো অলস ও অসতর্ক মুহূর্তে। এ বিষয়টা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুললো। মুসলিম বাহিনী বিষয়টা আমলে না নিলে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু একটু পরই আমার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেলো। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিলেন। তিনি পঞ্চাশজন দক্ষ তীরন্দাজকে সেখানে একটা ছোট্ট পাহাড়ে সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত করলেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন:
-মুসলমানদের জয়-পরাজয় যাই হোক, কোনো অবস্থাতেই এ-স্থান ত্যাগ করা যাবে না।[১]

মুসলিম বাহিনীকে কাতারবদ্ধ করলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। ওদিকেও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কোরাইশ বাহিনী। একটু পর শুরু হলো লড়াই। ওদের চোখে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। আর মুসলিম বাহিনীর দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করছিলো জিহাদী চেতনা। সে দৃষ্টি যেনো বলছিলো:
-আমরা জালিমকে ভয় পাই না। আমরা জানি, কেমন করে জালিমের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হয়। কীভাবে জুলুমের মূলোৎপাটন করতে হয়।

✵ ✵ ✵

শুরু হলো ভয়ানক লড়াই। প্রথমেই একক যুদ্ধ। এদিক থেকে এগিয়ে গেলেন হযরত হামযা—বদর যুদ্ধের প্রথম বীর। ওদিক থেকে যে এসেছিলো তাঁর মুকাবিলায়, সে ছিলো কোরাইশ বাহিনীর নিশানবরদার। কিন্তু অল্পক্ষণেই তার হাত থেকে নিশানটা পড়ে গেলো। মহাবীর হামযা তাকে এক আঘাতেই পাঠিয়ে দিলেন জাহান্নামে।

---

১ إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القـــوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . (صحيح البخارى)

এরপরই শুরু হলো সম্মিলিত আক্রমণ। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখে যাচ্ছিলাম মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব। আমার চোখে এ-যুদ্ধের তিনটি চিত্র আকাশের তারকার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এ তিনটি চিত্রের কথাই আমি আগে বলি।

চিত্র-১

মুসলিম বাহিনী দুশমনের সাথে লড়ে যাচ্ছিলো বীর-বিক্রমে। যেদিক দিয়েই তাঁরা দুশমনের কাতার ভেদ করছিলেন সেদিকেই তাঁদের বীরত্ব আগুনের ফুলকির মতো জ্বলছিলো। সৃষ্টি হচ্ছিলো শত্রু-শিবিরে ত্রাস, মহাত্রাস। কোরাইশ সৈন্যরা সংখ্যায় ত্রিগুণ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের হামলা ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছিলো। মুসলমানরা লড়ছিলেন শাহাদতের ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে, আর মুশরিকরা লড়ছিলো— জান বাঁচিয়ে অস্ত্র বাগিয়ে 'লেজ' গুটিয়ে। ইতিমধ্যে কোরাইশ বাহিনীর সাত পতাকাধারীর সবাই একে একে 'ভূতলশায়ী' হয়েছে। কোরাইশ বাহিনী বেসামাল হয়ে গেলো। পালিয়ে বাঁচা ছাড়া আর কোনো রাস্তাই তাদের নজরে এলো না। সুতরাং সবাই পালাতে লাগলো। মুসলমানরা তাদেরকে তাড়া করে বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর আবার ফিরে এলেন। মুসলিম শিবিরে বিজয়ের আলো ফুটে উঠলো!

এই চিত্রটা আমার চোখে কেবলই রাঙা আলো ছড়াচ্ছিলো। কিন্তু এই রাঙা আলো-যে একটু পরই গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে যাবে তা আমি ভাবতেও পারি নি। এখন বলি সে অন্ধকার চিত্রের কথাই।

চিত্র-২

এই দ্বিতীয় চিত্রের কথা বলতে আমি দুরুদুরু কাঁপছি। আমার কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমার মাঝখান দিয়ে যে গিরিপথটা ছিলো যেখানে সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ, সে কথা আমি আগেই বলেছি। তাঁরা বিজয়ের প্রথম প্রহরেই এতোটা উল্লসিত হয়ে উঠলেন যে আল্লাহ্‌র নবীর সতর্কবাণীর গুরুত্বের কথা তাঁরা আমলেই নিলেন না। দশজন ছাড়া সবাই স্বস্থান ত্যাগ করে মালে গণিমত কুড়াতে ছুটে গেলেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের শিক্ষা তাঁরা ভুলে গেলেন। আর ওই দিকে

ওঁত পেতে-থাকা কোরাইশ বাহিনীর ঘোড়সওয়াররা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ঐ গিরিপথ দিয়েই ধেয়ে এলো। অবশিষ্ট দশজন তাদেরকে কোনভাবেই ঠেকাতে পারলেন না, সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ সসৈন্যে একেবারে আল্লাহ্‌র নবীর কাছাকাছি চলে এলেন। মুহূর্তেই মুসলমানদের বিজয়ের উপর নেমে এলো কোরাইশ বাহিনীর ঝড়ো আক্রমণ। মালে গণিমত সংগ্রহে ব্যস্ত মুসলমানরা কোমর সোজা করে দাঁড়াতেও পারলেন না, এর মাঝেই শুরু হয়ে গেলো প্রতিপক্ষের সাঁড়াশি আক্রমণ। একটু আগে যে-কোরাইশ পালিয়ে জান বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলো, তারাও এখন নতুন উদ্যমে ফিরে এলো এবং মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমি —ওহুদ পাহাড়— এ দৃশ্য দেখছিলাম আর দুঃখে বেদনায় ফেটে পড়ার উপক্রম হচ্ছিলাম। হায়! ছোট্ট দলের একটা ছোট্ট ভুল কী ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চিত বিজয়কে বিপর্যয়ে বদলে দিলো! আল্লাহ্‌র রাসূলের উপরও এলো আঘাত! আহ! তাঁর রক্ত দেখে আমি কী-যে কষ্ট অনুভব করছিলাম! আল্লাহ্‌র রাসূল আমার একটা ফাটলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন আহত হয়ে! এদিকে তখন শয়তান এ-কথা মশহুর করে

দিলো যে মুহাম্মদ 'মারা গেছে'! উত্তেজনায় উন্মাদনায় কাফেররা উল্লাস করতে লাগলো। তারা যেনো ধরেই নিয়েছিলো যে ইসলামের দিন শেষ। মুসলমানদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। ওহুদেই রচিত হবে তাদের শেষ সমাধি।

চিত্র-৩

আল্লাহ্‌র রাসূলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর আবেগভরে এক সাহাবী বলে উঠলেন:

-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্যি সত্যি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে আমরা জীবন দিয়ে কী আর করবো?! যে পথে তিনি চলে গেছেন সে পথে তোমরাও জীবন বিলিয়ে দাও!

এ-ঘোষণার পর আবার সবাই একত্রিত হতে লাগলেন। সবার মাঝে মনোবল ফিরে এলো। আবার তাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এর মাঝেই ভেসে এলো একজনের কণ্ঠে সুসংবাদ— মিথ্যে, সব মিথ্যে! আল্লাহ্‌র রাসূল মারা যান নি! তিনি জীবিত আছেন, সুস্থ আছেন!

সাথে সাথে সবার মন আনন্দে দুলে উঠলো! আবার তারা জীবনপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমার উপরে উঠে এসে তাঁরা বিপদমুক্ত অবস্থান নিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্যরা উপরে উঠে আসতে চাইলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর তীরবৃষ্টি ও পাথরবৃষ্টি তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করলো। দূরে হটিয়ে দিলো। এরপর কোরাইশ বাহিনী আর সুবিধে করতে পারলো না, তারা বারবার আক্রমণ শাণিত করতে চাইলো, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হলো।

✹ ✹ ✹

তীরন্দাজদের একটা ভুলের কারণে যুদ্ধে সাময়িকভাবে ফিরে এলেও এখন তারা ভালোই বুঝতে পারছে— না, মুসলমানদেরকে শেষ করা যাবে না! বরং সময় যতো গড়াবে মুসলমানরা ততোই ফুঁসে উঠতে থাকবে। তার আগেই ময়দান ছাড়তে হবে। সোজা মক্কার পথ ধরতে হবে। কোথাও আর থামা যাবে না। অবশ্য মদীনায় এখন আক্রমণ করা যায়। কেননা মদীনা এখন ফাঁকা—প্রায় বীরশূন্য। কিন্তু মদীনায়

আমাদের ভাগ্যে কী লুকিয়ে আছে তা এই মুহূর্তে অজানার আঁধারে ঢাকা। বরং এখন বিজয়ের যে গৌরবটা নিয়ে মক্কায় ফিরা যাবে, মদীনা আক্রমণ করলে তাও উল্টো বদলে যেতে পারে। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দটা একেবারেই ভেস্তে যেতে পারে—ধুলোয় মিশে যেতে পারে। সুতরাং জয় হোবল, জয় হোবল! মক্কা চলো, দ্রুত মক্কা চলো!

আবু সুফিয়ান চলে যেতে যেতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন:
-আজ আমরা বদরের প্রতিশোধ নিলাম। বদর ছিলো তোমাদের। ওহুদ হলো আমাদের। যুদ্ধ হলো জয়-পরাজয়ের খেলা। একদিন তোমাদের, একদিন আমাদের। আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে।

✺ ✺ ✺

যুদ্ধ এখানেই শেষ। আমি অশ্রু ছলোছলো চোখে আমার আশপাশে তাকালাম। আহ! আর সইতে পারছি না! ঐ-যে ওখানে পড়ে আছে বীর হামযার ক্ষত-বিক্ষত দেহ! হিন্দা কী পিশাচিনীর মতো বুক চিরে তাঁর কলিজাটা বের করে চিবিয়েছে! আরো পড়ে আছে অন্যান্য শহীদানের দেহ। আশ্‌পাশে পড়ে ছিলেন আহতরাও।

কোরাইশ বাহিনী ময়দান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আবার আমার মাথায় সেই দুশ্চিন্তাটা ফিরে এলো— এরা সব এখন মদীনায় গিয়ে চড়াও হবে না তো! মদীনার রাস্তা একদম ফাঁকা। রুখে দাঁড়াবার বিশেষ কেউ নেই ওখানে। মুসলমনরা সবাই এখানে আমার কাছে। এদের মদীনায় ফিরে যেতে একটু সময়ও লাগবে। শহীদদের দাফন-কাফন বাকি। আহতদের প্রাথমিক পরিচর্যা বাকি। তারপর ধীরে ধীরে মদীনায় যেতে হবে। এর মাঝে তো কাফেররা মদীনায় গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে! আমি আবার কেঁপে উঠলাম! উদ্বেগভরে কোরাইশ বাহিনীর গতিবিধিটা বোঝার চেষ্টা করলাম। একটুপর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। না, ওরা মদীনা নয়— মক্কার পথ ধরেছে!

বিজয়ের আনন্দ কি ছিলো ওদের মনে? না, ছিলো না। থাকার কথাও না। প্রকৃত বিজয়টা তো আসলে ওরা অর্জন করতে পারে নি। প্রকৃত বিজয় ছিলো

মুসলমানদেরই। তবে এ বিজয়টায় অনেক রক্ত ঝরেছে, ছোট্ট ঐ ভুলটার কারণে। এ জন্যেই ওরা মক্কায় যেতে যেতে বলাবলি করছিলো—

আমরা কি বিজয়ী!

তাহলে আমাদের মালে গণিমত কোথায়?

কই, একজন বন্দিও তো আমাদের সঙ্গে নেই!

কোথায় আমাদের বিজয়?!

কেনো আমরা এখন মদীনায় না গিয়ে মক্কায় ফিরে যাচ্ছি?

আমরা তো এসেছিলাম ইসলাম ও মুসলমানদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে! তাহলে তা না করে আমরা মক্কার পথ ধরলাম যে!

✸ ✸ ✸

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদানের দাফন সম্পন্ন করলেন। চাচাজান হামযার বিকৃত লাশ দেখে তিনি অঝরে কাঁদলেন। সাহাবীরা অমন করে কাঁদতে দেখেন নি প্রিয় নবীকে কখনো!! তারপর ভেজা চোখে আল্লাহ্‌র রাসূল মদীনায় ফিরে গেলেন। আমার চোখও ছিলো তখন ভেজা। রাসূলের ভালোবাসায়, শহীদানের ভালোবাসায়, শহীদানের স্বজনদের কান্নায়! কিন্তু মদীনায় ফিরার পরে রাতটা পার হতে-না-হতেই আবার এলো নতুন যুদ্ধের নতুন ঘোষণা। জানা গেছে আবু সুফিয়ান নাকি সহ-যোদ্ধাদের গরম গরম কথায় আবার মদীনা আক্রমণের জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং ১৬ই শাওয়াল ফজর শেষে আবার আল্লাহ্‌র রাসূলের নেতৃত্বে এগিয়ে চললেন বীর সাহাবীরা, আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে ।

'হামরাউল আসাদ' পৌঁছে তাঁরা থামলেন। এমন কি সেখানে তিনদিন আবু সুফিয়ানের অপেক্ষাও করলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ানের আর কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। আসলে তিনি দ্বিতীয়বার আল্লাহ্‌র নবীর বের হওয়ার সংবাদ পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার মক্কার দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। 'হামরাউল আসাদ' এসে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া তো দূরের কথা; বরং পরাজিত সৈন্যদের সেনাপতির মতো তিনি ক্রমেই 'পলায়নের' গতি

বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বলা তো যায় না, মুসলিম বাহিনী 'হামরাউল আসাদ' থেকে এদিকেই আবার ছুটে না আসে!

❋ ❋ ❋

'হামরাউল আসাদ'-এ তিনদিন অবস্থান করে ১৯ তারিখ আবার ফিরে এলেন আল্লাহ্‌র রাসূল মদীনায়। আমার কোল ঘেঁষেই মদীনায় প্রবেশ করছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল ও সাহাবীরা। তাঁরা আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে, ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে! তাঁরা আমাকে ভালোবাসেন, আমিও তাঁদেরকে ভালোবাসি! এ-ভালোবাসার কথা আমার মুখের দাবি নয়— এর ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই বলে—

جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة

ওহুদ পাহাড় ভালোবাসে আমাদেরকে আমরাও ভালোবাসি তাকে। ওহুদ জান্নাতের একটি পাহাড়।

যুদ্ধ যখন ওদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিলো তখন আমি তাঁদের পেছন দিকে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম-যে! কিন্তু মুসলিম উম্মাহর জন্যে আমি একটি শিক্ষাও বটে। এ-শিক্ষা হলো— সেনাপতির নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। পাশাপাশি এ-শিক্ষাও লুকিয়ে আছে আমার চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া এ যুদ্ধে— যদি থাকে ইসলামের আদর্শের জন্যে আত্মনিবেদনের দৃঢ় প্রত্যয় ও দীপ্ত অঙ্গীকার, তাহলে হাজার বিপর্যয়েও সাফল্য অনিবার্য! যুদ্ধের হিসাবে মুসলিম বাহিনী সীমাহীন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আত্মনিবেদনের এ-প্রত্যয়ই শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে সব বিপর্যয় কাটিয়ে বিজয় পাইয়ে দিয়েছিলো।

✵ ✵ ✵

হ্যাঁ, আমি এখনো আছি। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে, সেই ত্যাগময় বীরত্বময় যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে। দাঁড়িয়ে আছি একেবারে মদীনার কোল ঘেঁষেই। আমাকে যারা দেখতে আসে, আমার পাশে শুয়ে থাকা শহীদানের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যারা অশ্রু ঝরায়, বাতিলের মুকাবিলায় জীবনপণ লড়াইয়ের শপথ নেয়,

তাদের কানে কানে আমার বলতে ইচ্ছে করে—

তোমরাও বুঝি আমাকে ভালোবাসো,

নবীকে ভালোবাসো,

নবীর সাহাবীদেরকে ভালোবাসো!

তাহলে শোনো—আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি!

আমি একটি পাথরখণ্ড

পাথরখণ্ড! তোমরা তো জানোই, সে ভীষণ শক্ত ও কঠিন। টলে যায় না, গলে তো যায়ই না। কুঠারাঘাতেও তা ভেঙে পড়তে চায় না, একটু কেঁপেও ওঠে না। কিন্তু আমি কোন্ পাথরখণ্ড? কোথায় আমার অবস্থান? হ্যাঁ .. এ-সব বলতেই তোমাদের সামনে 'হাজির' হয়েছি। শোনো আমার কাহিনী—
আমার অবস্থান মদীনার কাছেই। এখানে অবস্থান করেই আমি দেখেছি মদীনার দিন-রাত, তার অসংখ্য ঘটনা-প্রবাহ। আরো দেখেছি হিজরতের আগের মদীনা এবং হিজরতের পরের মদীনা। হিজরতের পর মদীনা কতো বদলে গিয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূলের আগমনে মদীনা যেনো রূহ পেয়েছে। মদীনার খেজুর বাগানে যেনো নতুন করে শ্যামলিমা ফিরে এসেছে।

আমি শুনেছি বদরের ঐতিহাসিক বিজয়ের কথা। আমি আরো শুনেছি ওহুদের রক্তঝরা বিজয়ের কথা। আমি আরো শুনেছি ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কথা। দ্বিমুখী আচরণের কথা। ওদের অমার্জনীয় বজ্জাতির কথা। কানে কানে শুনেছি আর মর্মে মর্মে জ্বলেছি। মানুষ এতো বজ্জাত হয়? মানুষ এতো বিদ্বেষী হয়?!

এখন আমি তোমাদেরকে বলবো খন্দক যুদ্ধের কাহিনী। এ খন্দক যুদ্ধের ইন্ধনদাতা ছিলো এই বজ্জাত ইহুদীরা। এরা বদর-ওহুদের পর গোপনে গোপনে মদীনার বিভিন্ন গোত্রে ঘুরে ঘুরে মানুষকে আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিলো। এভাবে মদীনায় ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে ওরা গিয়েছে মক্কায়, ঐ একই উদ্দেশ্যে।

সেখানে গিয়েও তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোরাইশসহ বিভিন্ন গোত্রকে উসকে দিতে লাগলো। একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ে সংঘবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে সবাইকে প্ররোচিত করতে লাগলো। তারা সবাইকে এ-কথাও বিশ্বাস করাতে চাইলো যে, যদি সবাই এখন কোরাইশের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণ করে, তাহলে ইসলাম ও মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর যদি কেউ তাদের এ-ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে কেউ-ই বাঁচতে পারবে না, কোনোদিন তারা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। ভবিষ্যত হবে শুধু মুসলমানদের। নেতৃত্ব হবে কেবল মুহাম্মদের।

ইহুদীরা এ-অপতৎপরতায় সফল হলো। কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানসহ সব গোত্র-নেতাই তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলো— শিগগির তারা মদীনা আক্রমণ করবে। এই আশ্বাস পেয়ে ইহুদী প্রতিনিধি দলটি মদীনায় ফিরে এলো, অভিযান সাফল্যের তৃপ্তি নিয়ে। এরপর তারা ভিতরে ভিতরে অপেক্ষা করতে লাগলো কখন আসবে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বিশাল সম্মিলিত আরব বাহিনী।

✸ ✸ ✸

বেশী দিন অপেক্ষা করতে হলো না। তারা খবর পেলো যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কোরাইশসহ অন্যান্য গোত্রের মদীনা আক্রমণের মহা রণপ্রস্তুতির কথা এবং মদীনার দিকে ওদের ধেয়ে আসার খবর যথা সময়েই জানতে পারলেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইসলামের নবী জরুরী পরামর্শসভা তলব করলেন। সাহাবীদের কাছে তিনি জরুরী পরামর্শ চাইলেন— কেমন করে এই বিশাল বাহিনীকে প্রতিহত করা যায়। মদীনার ভিতরে থেকেই না মদীনার বাইরে গিয়ে। হযরত সালমান ফারসী রা. এক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন:

-আমরা মদীনার ভিতরে থেকেই শত্রুকে প্রতিহত করতে পারবো, ইনশা আল্লাহ। আমরা মদীনাকে একটি সুরক্ষিত দূর্গে পরিণত করবো। আর এ জন্যে আমাদেরকে শুধু মদীনার অরক্ষিত জায়গাটিতে একটি পরিখা খনন করতে হবে। তাহলে দুশমন

সংখ্যায় যতো বেশীই হোক, কিছুতেই সেই পরিখা [১] অতিক্রম করে মদীনা আক্রমণ করতে পারবে না। আমাদের কাছে ঘেঁষতে চাইলে কঠিন মূল্য দিতে হবে তাদেরকে, আমাদের প্রচণ্ড 'তীরবৃষ্টি'র মুখোমুখি হতে হবে তাদেরকে।
আল্লাহ্‌র রাসূল এই প্রিয় সাহাবীর পরামর্শ খুব পছন্দ করলেন এবং অবিলম্বে সবাইকে নিয়ে পরিখা খননের কাজও শুরু করে দিলেন।

✵ ✵ ✵

পরিখা— সে মোটেই সহজ কাজ ছিলো না। এই কঠিন বিশাল ও অচেনা কাজটি করতে সাহাবীদেরকে সীমাহীন কষ্ট করতে হয়েছিলো। আল্লাহ্‌র নবীও বসে থাকেন নি, এ-কাজে পুরোদমে প্রিয় সাহাবীদেরকে তিনি সহযোগিতা করেছেন। একেবারে 'মাটি-কাটা কামলা'র বেশে তিনিও লেগে গেলেন মাটি খোঁড়ায়। টুকরি ভরে ভরে মাটি উপরে তুলতে লাগলেন অন্য সবার মতো। ধুলো আর মাটিতে ঢেকে গিয়েছিলো তাঁর সাদাভ পেট! কর্মব্যস্ত নবী সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতে আবৃত্তি করছিলেন এই কালজয়ী কবিতা—

اللهم لولا أنت ما اهتدينا　　ولا تصدقنـــا ولا صلينا

فأنـــزلن سكـــينة علـيـــنا　　وثبت الأقدام إن لاقـــينا

إن الأعادي قد بغوا علينا　　وإن أرادوا فتنـــة أبيـــنا

'হে আল্লাহ! যদি না পেতাম তোমার হিদায়াত,
কী করে তোমার পথে করতাম দান আর পড়তাম নামায!
এখন চাই আমাদের উপর বর্ষিত হোক তোমার শান্তিধারা।
আর অটল-অবিচল রেখো আমাদেরকে দুশমনের মুকাবিলায়।
মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে ষড়যন্ত্রে। কিন্তু কী হয়েছে তাতে?
তারা বিশৃঙ্খলা চাইলেও আমরা তো আর চাইতে পারি না!'

✵ ✵ ✵

---

১. অর্থাৎ মাটি কেটে গভীর খাদ তৈরী করা

পনের দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর শেষ হলো গভীর পরিখা বা খাদ খননের কাজ। তিন হাজার গজ দীর্ঘ এবং পাঁচ গজ গভীর। প্রস্থটাও একেবারে কম ছিলো না, সৈন্য বলো আর ঘোড়া বলো, কারো পক্ষেই তা অতিক্রম করা সম্ভব ছিলো না। তবে খনন কাজ এক জায়গায় এসে আটকে পড়লো। ঐ দিকটায় ছিলাম আমি—পাথর খণ্ড। এখানে খননের দায়িত্ব পড়ে ছিলো পরামর্শদাতা হযরত সালমান ফরসী রা. এবং একদল সাহাবীর। হযরত সালমান রা. অনেক ঘাম ঝরিয়েও আমার কিছুই করতে পারলেন না। যেমন ছিলাম তেমনি রইলাম। আগেও আমি তোমাদেরকে বলেছি, আমি ভীষণ শক্ত ও কঠিন। অগত্যা তিনি ছুটে গেলেন নবীজীর কাছে, ঘামতে ঘামতে। 'অভিযোগ' জানালেন আমার অটলতা ও অনড়তার বিরুদ্ধে! নবীজী সব শুনে এগিয়ে এলেন। হযরত সালমানকে একটু পানি আনতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পানি নিয়ে এলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল তখন পানির পাত্রটা হাতে নিয়ে আমার গায়ে কিছুটা পানি ঢেলে দিলেন! তখন আমার মনে হলো, তাঁর পবিত্র হাতের সেই বারি-শীতলতায় আমার ভিতরটা মধুর এক সঞ্জীবনীতে প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছে! পাশাপাশি আমার ভিতর থেকে যেনো একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি—সাবধান! এখন বিসর্জন দিতে হবে তোমার অনড়তা-কঠোরতা! এখন কুঠার হাতে নেবেন প্রিয় মুহাম্মদ! নরম হও, ভেঙে পড়ো! এখন নবীজীর আঘাতে আঘাতে তুমি দ্যুতি ছড়াবে। সে দ্যুতিতে দ্যুতিময় হয়ে ওঠবে সুদূর শামের লাল প্রাসাদগুলো—তাঁর চোখের সামনে! আরো ভেসে ওঠবে পারস্যের শুভ্র প্রাসাদগুলো— তাঁর চোখের সামনে ! আরো ভেসে ওঠবে সান'আর প্রবেশদ্বার!

হযরত সালমানের কাছ থেকে কুঠারটা নিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর আঘাত করলেন—

একবার!

দুইবার!!

তিনবার!!!

প্রথম আঘাতে ভেঙে গেলাম কিছুটা!

দ্বিতীয় আঘাতে ভেঙে গেলাম আরো কিছুটা!!

তৃতীয় আঘাতে ভেঙে গেলাম পুরোটা!!!

প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্যুত-ঝলকে আলোকিত হয়ে উঠছিলো কুঠারের নিচটা এবং আশপাশ!

তৃতীয় আঘাতে আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তেই সমবেত সাহাবীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন—

আল্লাহু আকবার!

আল্লাহু আকবার!!

আল্লাহু আকবার!!!

✵ ✵ ✵

পরিখা খনন শেষ হতে-না-হতেই ১০ হাজার বাহিনীর বিশাল বহর নিয়ে সম্মিলিত আরব বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান পৌঁছে গেলেন। কিন্তু পরিখার পাড়ে এসে তিনি সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন! এ অভিনব যুদ্ধ-কৌশল দেখে দৃষ্টি তার ছানাবড়া! তাঁর বিস্ময়ভরা চোখ যেনো বলছিলো— এটা পেরিয়ে মদীনা আক্রমণ করা কী করে সম্ভব! এ-পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা, সে-তো আরো কঠিন! কারণ ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর নেতৃত্বে ৩ হাজার বীর লড়াকু সাহাবী, তীর তলোয়ার নিয়ে!

রাতের অন্ধকারে অবশ্য পরিখা পার হওয়ার একটা চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সেখানেও তো বিপদ, মহা বিপদ। কারণ তখনো নিশ্চিত ঝেঁপে আসবে তীরবৃষ্টি! একে তো গভীর খাদ পেরোনোর প্রশ্ন, দ্বিতীয়তঃ রাতের অন্ধকার, তৃতীয়তঃ হাজার হাতের

ঝড়ো বেগের তীরবৃষ্টি, সাথে আছে হাড়-ভেদ-করা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা! নাহ, সব এলোমেলো মনে হচ্ছে! আমরা পৌঁছতে কি দেরী করে ফেললাম!

✺ ✺ ✺

কিন্তু সেনাপতি ঘাবড়ালেন না। পিছু হটারও চিন্তা করলেন না। বরং খাদের এ-পাড়ে বসে অবরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। দিশেহারা সম্মিলিত আরব বাহিনী'র সামনে এ ছাড়া আর কোনো পথও ছিলো না। সুতরাং তারা অবরোধ গড়ে তুললো। ক্ষণে ক্ষণে চলতে লাগলো উভয় পক্ষের মাঝে তীর বিনিময়। এভাবে বিশ দিন কেটে গেলো। অবরোধ ধীরে ধীরে কঠোর হতে লাগলো। মুসলিম শিবিরে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলো। অনাহারে অর্ধাহারে কাটতে লাগলো—

কষ্ট-প্রহর।

ত্যাগ-প্রহর।

ধৈর্য-প্রহর।...

এদিকে এ সঙ্গিন অবস্থায় এলো আরেক দুঃসংবাদ, ভয়াবহ দুঃসংবাদ! নবীজী জানতে পারলেন যে, চুক্তি ভেঙে মদীনার ইহুদীরা মুশরিক বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে! পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর হামলা করারও তারা ষড়যন্ত্র করছে!

ওদের আচরণ বদলে গেছে।

ওদের ভাষাও বদলে গেছে।

যে কোনো মুহূর্তে ওরা হামলে পড়তে পারে।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বিপদের উপর বিপদ, মহা বিপদ!

শত্রুর পাশে শত্রু, মহা শত্রু!

সামনে শত্রু, পেছনে শত্রু!

দুশ্চিন্তায় আশঙ্কায় মুসলমানদের লবেজান অবস্থা!

দৃষ্টি তাদের বিস্ফারিত!

প্রাণ তাদের কণ্ঠাগত!

মনে তাঁদের প্রশ্ন—
আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন্ আসবে?
সাহায্য কি আসবে না?!
বিপদ কি কাটবে না?!
আরশ কি দোলবে না?!

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নবী। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। তাই তিনি ভেঙে পড়লেন না। হতাশ হলেন না। দক্ষতার সাথে, প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে লাগলেন। দ্রুত ইহুদীদের দিকটায় সতর্ক ও শক্ত প্রহরা বসিয়ে দিলেন। অন্য দিকে তিনি কথা বলছিলেন আরব বাহিনীর বিভিন্ন গোত্রের সাথে, সন্ধি নিয়ে। আরেক দিকে শুনাচ্ছিলেন মুসলমানদেরকে সুসংবাদ, বিজয়ের সুসংবাদ। তবে শর্ত হলো, তাদেরকে সবর করতে হবে। অবিচল থাকতে হবে।

আল্লাহ্‌র নবী দু'আও করতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র সকাশে সকাতর প্রার্থনায় অশ্রুতে ভেসে যেতে লাগলেন। উত্তাপময় গলায় তিনি বলছিলেন—

اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.

'হে আল্লাহ! তুমিই তো নাযিল করেছো কুরআন! তুমিই তো দ্রুত বিচার-আদালতের আহকামুল হাকিমীন—মহা বিচারক! এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করো! আমার আল্লাহ! তুমি এদেরকে পরাজিত করো! এদের ভিত কাঁপিয়ে দাও!'

হাজার হাজার দুশমন, কূটিল কূটিল ষড়যন্ত্র, বাইরের দুশমন, ভিতরের দুশমন, বাইরের ষড়যন্ত্র, ভিতরের ষড়যন্ত্র— সব ভেদ করে আল্লাহ্‌র সাহায্য নামতে লাগলো! সদ্য ইসলাম কবুল করা সাহাবী নু'আইম ইবনে আবদুল্লাহর সহযোগিতায় আল্লাহ্‌র রাসূল ইহুদী শিবির এবং কোরাইশ শিবিরের মধ্যে অবিশ্বাস অনাস্থা ও সন্দেহ তৈরী করে তাদের ঐক্যে বিরাট ফাটল ধরিয়ে দিলেন। পাশাপাশি আসমান থেকেও নেমে এলো সাহায্য, মহা সাহায্য! এ সাহায্যের নাম— বৃষ্টি! কেমন করে বৃষ্টি নামলো? টাপুর-টুপুর কিংবা রিমঝিম? না, বরং বৃষ্টি নামলো—

দমকা হাওয়ায় 'পাগল' হয়ে,
মাতাল হাওয়ায় 'দানব' হয়ে!
প্রবল বেগে বয়ে গেলো তা গভীর রাতের তিমির আঁধারে! 'পরশ' বুলিয়ে গেলো আরব বাহিনীর তাঁবুতে!
সে পরশে সব তছনছ হয়ে গেলো, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো!
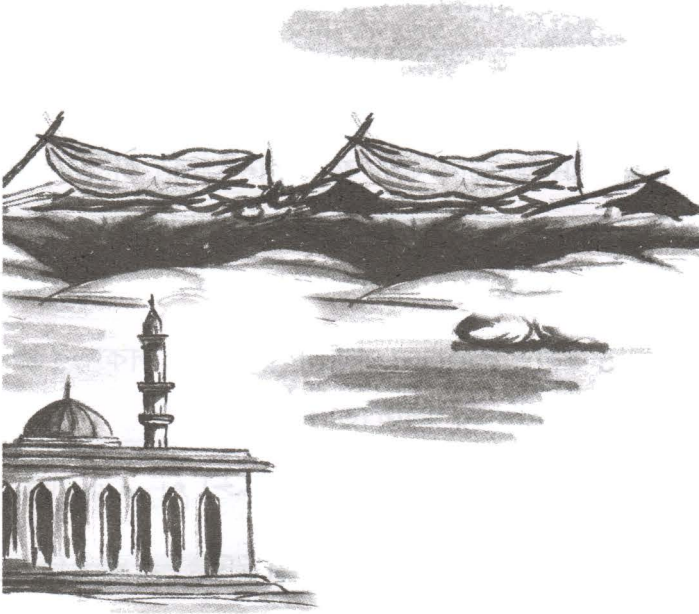
শত শত তাঁবু সেই ঝড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে কোন্ দিকে-যে ছুটে গেলো, ('কোন্ বনে যে পালিয়ে গেল') তার আর কোনো হদিসই রইলো না। রান্না করে খাওয়ার জন্যে সঙ্গে নিয়ে-আসা হাড়ি-পাতিলগুলোরও একই দশা! ভয়ে কম্পনে সেনাপতি আবু সুফিয়ানসহ সবার অবস্থা আরো করুণ, আরো অবর্ণনীয়! তাই রাতটা শেষ হতে-না-হতেই সেনাপতি আবু সুফিয়ান বাকিদেরকে এক রকম না-বলেই সসৈন্যে মক্কার পথ ধরলেন—
পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে!
ঝড়ো বৃষ্টির তাড়া খেয়ে!!
দুঃসহ সব স্মৃতি নিয়ে!!!

আমি বকরী বলছি

আমি আমার স্বামীকে নিয়ে মুক্ত মরুর বুকে বেশ ছিলাম। মেষপালের সাথে ঘুরে বেড়াতাম হলুদাভ মরুবালির মাঝে। সেখানে রাখালেরা আমাদেরকে নিয়ে চষে বেড়াতো সবুজ ঘাসের খোঁজে, একটু পানির তালাশে, কোনো কূপের সন্ধানে। মেষপালেরা সময় কাটাতো যতোটা না ঘাস-পানিতে, তারচে' বেশী ছোটোছুটিতে। কখনো তারা কান খাড়া করে শুনতো রাখালের বাঁশি। কখনো আবার ভীড় করতো মক্কার রাখালের গল্প শুনতে। মক্কার রাখালের নাম মুহাম্মদ। বাল্যকালে তিনি রাখালি করেছেন। বকরী ও উট চরিয়েছেন মক্কার পাহাড়ি উপত্যকায়।

এই রাখাল-বন্ধু—মুহাম্মদের কথা আমরা যতো শুনতাম ততোই ভালো লাগতো। শুনে শুনে কান ভরতো কিন্তু মন ভরতো না। তাঁর উন্নত চরিত্র, তাঁর মানবতা, তাঁর আমানতদারী আমাদেরকে ভীষণ মুগ্ধ করতো। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমরা না-দেখেই তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আমরা আমাদের রাখালের মুখে শুনেছি, মুহাম্মদ যখন মেষ চরাতেন তখন মেষগুলোকে খুব আদর করতেন। সারাক্ষণ ওদেরকে চোখে চোখে আগলে রাখতেন। দলছুট হয়ে কোনো মেষ দূরে কোথাও চলে গেলে পেছনে পেছনে তিনিও ছুটে যেতেন, আদর করে ধরে আনতেন। কোথায় গেলে কী করলে ঘাস পাওয়া যাবে, পানি পাওয়া যাবে— এ নিয়েও তাঁর ব্যাকুলতার কোনো সীমা ছিলো না। অন্য রাখাল ছেলেদের মতো দৌড়-ঝাঁপ ও খেলাধুলায় তাঁর মন ছিলো না। বরং নিজের মেষপালের পেছনেই তিনি সময় দিতেন। ফলে নেকড়ে বলো আর ঐ শৃগাল বলো, কেউ কাছে ভিড়তে সাহস পেতো না। কখনো কোনো

ভেড়া ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি তাকে পথচলায় সাহায্য করতেন, তার ব্যাপারে আলাদা গুরুত্ব দিতেন। আর এই ক্লান্তিটা অসুস্থতায় রূপ নিলে তিনি শুধু সাহায্যই করতেন না একেবারে তাকে কাঁধে করে গৃহে ফিরে আসতেন। তারপর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতেন। সুস্থ হয়ে আবার ঐ মেষটা যখন ছুটোছুটি করতো, দলের সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতো, তখন গিয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। সুস্থতার পর মেষদের এই-যে লাফালাফি ও আনন্দ প্রকাশ, সেও যেনো রাখাল মুহাম্মদকে ঘিরেই ছিলো। ওরা যেনো তাদের প্রিয় রাখালকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলতো—

হে মুহাম্মদ!
পেয়েছি তোমার সেবা!
হয়েছি আমরা সুস্থ!
এই দেখো এখন কেমন সুন্দর লাফাচ্ছি!
শরীরে কী শক্তি শক্তি লাগছে!
যেনো অসুখই ছিলো না আমাদের!
এইসব হে মুহাম্মদ, বরকত তোমার!
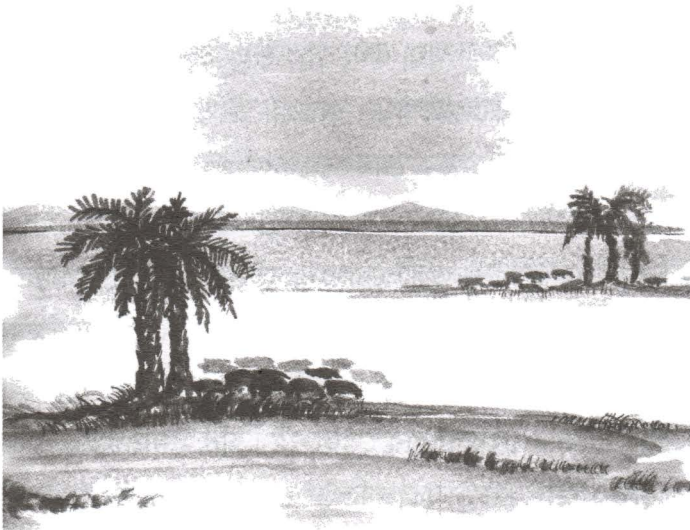
তুমি কতো ভালো!
রাখালদের সেরা রাখাল!
তোমাকে ধন্যবাদ, অনে-ক ধন্যবাদ!
মুহাম্মদ ছিলেন আসলেই এক বরকতময় রাখাল।
একটা দিনের জন্যেও তাঁর মেষপালকে না-খেয়ে কিংবা পেটে খিদে নিয়ে ফিরতে হয় নি। মুহাম্মদ যেখানেই মেষ চরাতেন সেখানেই নেমে আসতো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বরকত। ঘাস-পানির কোনো অভাব হতো না। তাই মুহাম্মদের মেষপালের স্বাস্থ্য ছিলো যেমন সুঠাম-সতেজ তেমনি দুধও দিতো তারা প্রচুর।

হ্যাঁ, এ-সব কারণেই আমরা মুহাম্মদকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তাঁর নতুন ধর্মের কথাও আমাদের কানে এসেছে। আমরা শুনেছি, মক্কার সেই রাখাল-বন্ধু এখন নবী হয়েছেন, প্রথমে মক্কার মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে ডেকেছেন। কিন্তু এতে কোরাইশ তেমন সাড়া দেয় নি। উল্টো তাঁকে এবং সাহাবীদেরকে কষ্ট দিয়েছে। ঈমান বাঁচাতে তাঁরা দেশছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন। সে সব কথা তোমরা জেনে এসেছো। এখন আমি মদীনার ইহুদীদের বজ্জাতি ও শত্রুতার কথা তোমাদেরকে বলবো। পরে আমার নিজের একটা কাহিনী বলবো।
ইহুদীরা সব সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এ কথা সে কথা বলে বেড়াতো। আসলে ইসলামের আগমনে এই বজ্জাতরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তাদের এই ভয়—
নিজেদের ধর্ম নিয়ে,
নিজেদের সম্পদ নিয়ে,
নিজেদের সরদারি ও কর্তৃত্ব নিয়ে,
নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে।
তাই এরা গোপনে গোপনে মানুষকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে উস্কে দিতে লাগলো। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে লাগলো।
আমরা সবাই দুশমনের অনিষ্ট ও ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর মুক্তি কামনা করছিলাম। তাঁর

জয় কামনা করছিলাম। তাঁর প্রচারিত ইসলামের প্রসার কামনা করছিলাম। করবো না কেনো? তিনি যে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত! তিনি যে সবার প্রতি—সবকিছুর প্রতি দয়ালু! অতি দয়ালু!

এবার শোনো আমার নিজের কাহিনী—

আমি একটু আগেই চারণভূমি থেকে ফিরেছি। মনটা ছিলো ভীষণ ফুরফুরে। একটা অজানা আনন্দে আমি ভাসছিলাম। আমার মনের জগতে কী যেনো একটা ফিসফিসানি আমি শুনতে পেলাম, যা শব্দায়িত হলে ভাবটা হতো এমন— ঐ দেখো, চারণভূমি থেকে ফিরে এসেছে ভাগ্যবান বকরীটা! হায়! আমাদেরও যদি অমন ভাগ্য হতো!

আমি ধীরে ধীরে আমার মালিকানের নিকটবর্তী হচ্ছি আর এই ফিসফিসানিটা ততোই এসে আমার কানে বাজছে। আমার মনকে আলোড়িত করছে! আমি থমকে দাঁড়াই, ভাবি— এমন তো আগে কখনো হয় নি! কিসের এই ফিসফিসানি? কেনো আমি এখন এতো আলোড়িত অনুভব করছি? অবশ্য আমার মালিকানের কাছে যেতেই রহস্যটা উন্মোচিত হলো! কী রহস্য আবার? আরেকটু খুলে বলি—

আমার মালিকান ছিলেন এক ইহুদী নারী। আমি তার কাছে এসেই জানতে পারলাম, তিনি আজ মুহাম্মদকে একটা বকরী রান্না করে খাওয়াবেন এইখানে—তার বাড়িতে। আর সেই বকরীটি হলাম আমি!

আনন্দ-শিহরণে আমার তনুমন দুলে উঠলো!

আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম!

আমি আমার 'প্রাণী-অস্তিত্ব' নিয়ে অমন বিরলতম সৌভাগ্য ও বিমলতম আনন্দ লাভ করবো— ওহ! ভাবতেই পারছি না!!

এতোক্ষণে বুঝলাম আমার কানের কাছে কেনো বাজছিলো ঐ ফিসফিসানি!

কিন্তু আমি প্রিয় মুহাম্মদের খাদ্য হতে যাচ্ছি—তাঁর রক্ত-মাংসের সাথে মিশে একাকার হতে যাচ্ছি— এটা আমার হৃদয়ে আনন্দ-অনুভূতির একটা মধুর শিহরণ সৃষ্টি করলেও একটু পরই তা একটা উদ্বেগজনক কালো আশঙ্কার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে

গেলো!! আমার আতঙ্কগ্রস্ত মন বললো— নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল আছে! আমার সজাগ প্রাণী-অনুভূতি জেগে উঠলো! অনুসন্ধান শুরু করে দিলো! এক ইহুদিনী কেনো ইসলামের নবীকে বকরী খাওয়াতে যাবে?! এ কি ভালোবাসা না ষড়যন্ত্র? ভালোবাসা তো হতেই পারে না! কারণ এই ইহুদিনী কেনো, সব ইহুদীর মনই তো ইসলাম-বিদ্বেষে ঠাসা?!

আমি কেঁপে উঠলাম! আমি শিউরে উঠলাম!! শত শত শঙ্কা আমার মনের একটু আগের কোমল অনুভূতিটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিলো! বরং মুহূর্তেই তা এক মহা শঙ্কায় রূপ নিলো! আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আমার মালিকান কোনো গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। এক ইহুদীনি ইসলামের নবীর কল্যাণ চাইতে পারে না—তাকে বকরী হাদিয়া দিতে পারে না। আমি চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। নবীজীর কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে— এ আশঙ্কায় আমি নিঃশব্দে আর্তনাদ করতে লাগলাম!

✵ ✵ ✵

একটু পরই কসাই এসে গেলো। তড়িৎ গতিতে সব করে ফেললো। চুলোয় আগুন জ্বালানো হলো। আমাকে চুলোয় চড়ানো হলো! আমি ভুনা হতে লাগলাম। একটু পর! হ্যাঁ, একটু পরই আমার গায়ে কী যেনো একটা ছিটিয়ে দিলো আমার মালিকান, সাথে সাথে আমার সারা অঙ্গে প্রচণ্ড জ্বালা শুরু হয়ে গেলো! একটু পরই আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো যে আমার মধ্যে মারাত্মক বিষ মেশানো হয়েছে, আর তা করা হয়েছে প্রিয় মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্যেই! কেননা এটা পরিস্কার যে, আমার এ বিষ-মেশানো খানিকটা অংশ কারো পেটে গেলে তার বেঁচে থাকা অসম্ভব! আগুনে আমি পুড়ছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাতে যতোটা না যন্ত্রণা হচ্ছিলো, তারচে' হাজার গুণ বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিলো আমার— সেই বিষের নীল দংশনে! আমি বিষ-দংশনে জ্বলতে জ্বলতে .. নীল হতে হতে আগুনে জ্বলার কথা ভুলে গেলাম! আমি এখন আর আমার কথা ভাবছি না, ভাবছি শুধু আল-আমীনের কথা। আমার মুহাম্মদের কথা। আমার রাখাল বন্ধুর কথা। এই খবিস মহিলা তো এখন—একটু পরই এই বিষের জ্বালা ও নীল-বেদনা ছড়িয়ে দেবে তাঁর দেহেও! আমার জন্যে সবচে' বেদনাদায়ক হলো,

আমি মুহাম্মদকে বাঁচাতে পারবো না! তাঁর সাহাবীদেরকেও বাঁচাতে পারবো না! উল্টো আমিই হায়, আমিই তাঁদের বিষাক্ত মৃত্যুর, নীল মৃত্যুর কারণ হবো! আল্লাহ! তুমি সাহায্য করো! আল্লাহ! তুমি রক্ষা করো!!
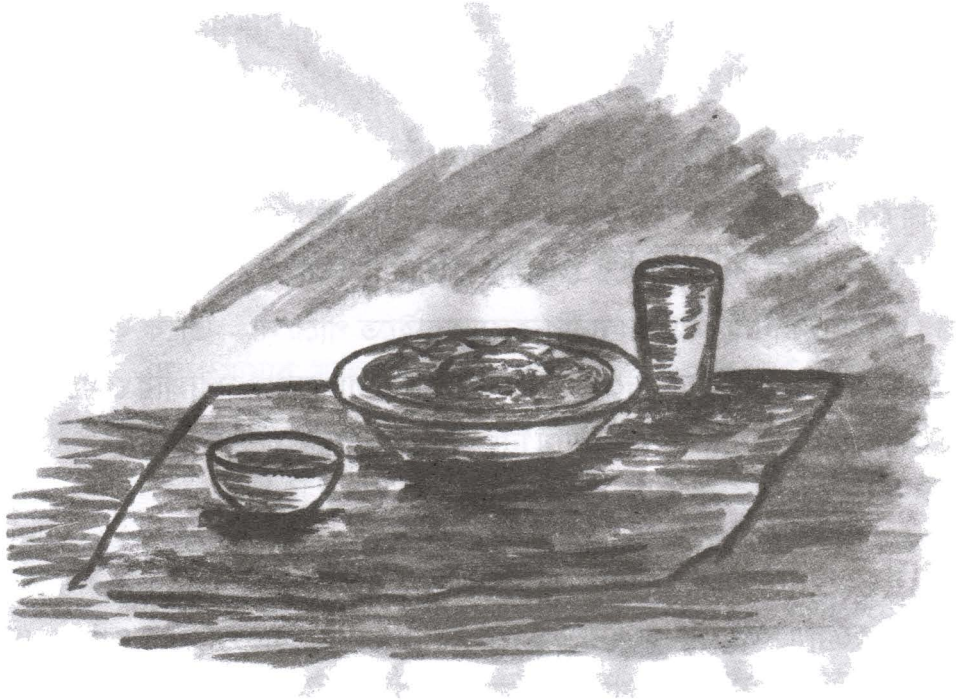
একটু পর মেজবানরূপী ইহুদিনী এগিয়ে এলো। আমাকে নবীজী ও সাহাবীদের সামনে এনে রাখলো। তখন তার মুখে লেগে ছিলো মেজবানের নির্মল হাসি কিন্তু হৃদয়ে ছিলো শত্রুর জিঘাংসা। সাহাবীদের মধ্যে হযরত বিশর ইবনে বারা রা. নবীজীর আগেই হাত বাড়ালেন আমার দিকে। গোশত খেতে উদ্যত হলেন। এমনকি এক টুকরো মুখেও দিয়ে দিলেন। আমি অন্ধকার দেখতে লাগলাম। আমি তাঁকে বলতে চাচ্ছিলাম— বিশর! কেনো তুমি নবীজীর আগেই খেতে শুরু করলে? কিন্তু তিনি তো আমার কথা শুনবেন না, শোনা সম্ভবও না। কিন্তু খোদ নবীজীও যখন খাওয়া শুরু করলেন, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, আমার কোনো ভাষা নেই, আমি এক নির্বাক প্রাণী— এ-সব ভাবার আর অবকাশ পেলাম না, বরং ঠিক বাকসম্পন্ন মানুষের মতোই জোরে চিৎকার করে উঠলাম—

'আমি বিষাক্ত!
আমি বিষাক্ত!!
আমি বিষাক্ত!!!'

সে ছিলো এক মহা বিস্ময়! আমি লক্ষ্য করলাম যে আল্লাহ্‌র নবী মুখে-পুরা টুকরোটি সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলেন! সাহাবায়ে কেরাম অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন!
তিনি কি তাহলে আমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন!
আল্লাহু আকবার! এমনটা হবে আমি ভাবতেই পারি নি!
আসলে এটা ছিলো আল্লাহ্‌র কুদরত!
তাঁর নবীর মু'জিযা!
নইলে আমি কেনো কথা বলবো?
তিনি কেনো শুনবেন?
স-বই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়েছে!
আল্লাহ চেয়েছেন আমি 'বিষ! বিষ!' বলে চিৎকার করে উঠবো,
আর তিনি তা প্রিয় নবীর কানে পৌঁছে দেবেন!
তাই হয়েছে! আল্লাহ তাই করেছেন!
আল্লাহ সব করতে পারেন!
নিষ্প্রাণ বকরীকে দিতে পারেন কণ্ঠ!
সে কণ্ঠ পৌঁছে দিতে পারেন নবীজীর কানে!
আল্লাহ্‌র রাসূল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন:
-হাত ওঠাও! কেউ খাবে না! এ গোশত বিষাক্ত!
সবাই হাত উঠিয়ে ফেললেন। কিন্তু হযরত বিশর ইবনে বারা রা. আগেই খেয়ে ফেলেছিলেন! তীব্র বিষক্রিয়ায় তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে—শাহাদতের সবুজ বিছানায়! নবীজীকে সতর্ক করতে পারার আনন্দে আমার হৃদয় উল্লাস করলেও এই সাহাবীর মৃত্যুতে আমি ছিলাম নীরব অশ্রুময়! নবীজীও বিশরের মওতে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি শোকমথিত কণ্ঠে ঐ ইহুদীনিকে ডেকে জানতে চাইলেন:

-কেনো তুমি এমন করলে?
মহিলাটা তখন জবাবে বললো:
-আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তুমি আসল নবী না ভণ্ড নবী! আসল নবী হলে বিষ তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না! আর যদি মিথ্যা নবী হও, দুনিয়ার রাজত্বের জন্যে নবী হওয়ার দাবি করে থাকো, তাহলে সব মানুষ তোমার হাত থেকে বেঁচে যাবে, তোমার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে!

এই ইহুদীনি তো তাহলে বুঝতে পেরেছিলো— মুহাম্মদ ছিলেন সত্যিকারের নবী। তাহলে কি সে তাঁকে নবী বলে মেনে নিয়েছিলো? অসম্ভব! ইহুদীরা এমনই! সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরও ওদের কপালে হিদায়াত জুটে না। ওরা ইসলামের চিরদুশমন, চির ইসলাম-বিদ্বেষী।

✺ ✺ ✺

এরপর আমাকে দাফন করে দেয়া হলো বালির বুকে। সমাধিস্থ হওয়ার পর আমি অনুভব করলাম চরম এক সুখ, অবর্ণনীয় এক প্রশান্তি। আহা! সেই সুখ ও প্রশান্তি জীবনে আমি আর কখনো অনুভব করি নি! এ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী'র প্রতি আমার ভালোবাসা ও দায়িত্ব পালনের পুরস্কার! আল্লাহ কতোজনকে কতোভাবে পুরস্কৃত করেন! কিন্তু আমার এ-প্রশান্তি হঠাৎ বেশ হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিলো যখন ঐ বজ্জাত ইহুদিনীকে আমার পাশেই দাফন করা হলো! হায়! ও যদি আমার কাছে সমাহিত না হতো! ওর গা থেকে-যে বিষের গন্ধ আসছে! ও-যে অভিশপ্ত! ও আমার প্রিয় নবীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো! আমি রাগে ক্ষোভে চিৎকার করে উঠলাম—
হে অভিশপ্ত ইহুদিনী! ভোগ করো এবার নবী-হত্যার অপচেষ্টার শাস্তি!!

আমি সেই খেজুর গাছ

আমি ছিলাম একটা আস্ত খেজুর গাছই। আরব দেশে খেজুর গাছের অভাব নেই। এর ফল অর্থাৎ খেজুর খেতে ভীষণ মজা ও উপকারী। আরবের মরু রাখালেরা ভর দুপুরের খর-তাপে আশ্রয় নেয় এই খেজুর গাছের শীতল ছায়ায়। ছোট্ট বেলায় যখন মুহাম্মদ মেষ চরাতেন তখন কতো বসেছেন এই ছায়ায়। বয়সে তখন রাখাল মুহাম্মদ ছোট্ট হলে কী হবে, বুদ্ধিতে আচরণে সুচরিত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ছোট ছোট রাখালেরা খেজুর গাছের ছায়ায় এসে বসতো ছোট্ট মুহাম্মদকে ঘিরে। তখন কী শান্ত ভঙ্গিতে, সুবচনে, সুহাসিতে তিনি ওদের সাথে কথা বলতেন। মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিতেন ওদের সুকুমার মন-মানস। সবার দৃষ্টি যেনো তখন বলতো—

প্রিয় মুহাম্মদ! তুমি আসলে কে?

তুমি কি আমাদের মতো শুধুই রাখাল?

মনে তো হয় না!

তাহলে আমরা কেনো তোমার মতো অমন সুন্দর করে কথা বলতে পারি না!

আমরা কেনো সুনীল আকাশপানে উদাস নয়নে নীলিমা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হতে পারি না?

আমাদের মেষপাল কেনো তোমার মেষপালের মতো অমন মোটাতাজা ও সুঠাম হয় না!

বলো তো, তুমি আসলে কে?

এই রাখাল বেশের আড়ালে কে লুকিয়ে আছে?

কী লুকিয়ে আছে?

সে কি কোনো মহা মানব?
সে কি কোনো মহা সূর্য?

❋ ❋ ❋

সেই বরকতময় শৈশব পেরিয়ে তারপর এলো স্নিগ্ধ কৈশোর তারপর এলো শান্ত যৌবন। মুহাম্মদ বড় হলেন। নবী হলেন। ইসলাম প্রচার করলেন প্রথম তিন বছর গোপনে, তারপর প্রকাশ্যে। তারপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা যখন বেড়ে গেলো, মক্কায় আর থাকা গেলো না, হিজরত করতে হলো মদীনায়। মদীনায় আসার পরই আমি প্রথম মুহাম্মদকে দেখতে পাই—চোখের দেখা। ধন্য হই তাঁর মোহন পরশে। কেননা এখানে এসে প্রায়ই তিনি আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসতেন। সাহাবায়ে কেরামের সামনে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলতেন। কুরআনের আয়াতের তাফসীর করতেন। আমি এবং আমার কাছে বসা সবাই মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতাম। নামাজের সময় হলে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়ে নিতেন। দু'আ করতেন, আল্লাহ যাতে বাড়িয়ে দেন মুসলমানদের সংখ্যা। সবাই যেনো উঠে আসতে পারে আলোর পথে, হিদায়াতের রাস্তায়। অসার মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আশ্রয় নিতে পারে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের ছায়ায়। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলে ইফতার করতেন আমারই তাজা খেজুর দিয়ে। সঙ্গে থাকতেন সাহাবীরাও। তখন সাহাবীদের সংখ্যা তো আর বেশী ছিলো না, তাই আমার একার খেজুরই সবার জন্যে যথেষ্ট ছিলো।

আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো এবং আমি যখন ফলদানে অক্ষম হয়ে গেলাম, আমার সবুজ শাখাগুলোতেও যখন খরা দেখা দিলো, তখন তাঁরা আমাকে কেটে ফেললেন! আমার লম্বা লম্বা শাখাগুলো তাঁরা বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে ফেললেন। বাড়ির ছাদে ব্যবহার করে ফেললেন। শুধু আমার গোড়াটা তাঁরা রেখে দিলেন। মাটি থেকে একটু উচ্চতায় আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়ে থাকলাম। ভাবতাম, জীবন কতো ছোট্ট! সেদিন-না আমি ছিলাম সবুজ পাতায় ছাওয়া! ফলে-ফলে ভরা! আজ কিছুই নেই! পাতা নেই! ফল নেই! আছে শুধু গোড়াটা! হয়তো এটাও কিছুদিন পরে থাকবে না! মহান সেই সত্ত্বা, যাঁর কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই—চিরবিরাজমান!

✷ ✷ ✷

আমি আগেই তোমাদেরকে বলেছি যে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার এখানে এসে বসতেন এবং তাঁদেরকে দীনি তা'লিম দিতেন। যখন তাঁদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো, তখন তিনি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন যাতে সবাই তাঁর কথা শোনেন এবং তাঁকে দেখেন। তারপর এ-সংখ্যা যখন আরো বেড়ে গেলো, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকালেন এবং আমার উপরে এসে দাঁড়ালেন, যাতে একটু দূরে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও তাঁকে দেখতে পারেন এবং তাঁর কথা শুনতে পারেন। আমি দেখতাম, তাঁর কথা শুনতে শুনতে সবার চোখ অশ্রু-ছলোছলো হয়ে উঠছে। কী গভীর মায়া ও মনোযোগ দিয়ে তাঁরা শুনতেন! এ-ই যেনো তাঁদের কাছে শেষ নবীর শেষ কথা! এ-ই যেনো তাঁদের শেষ শোনা! আমি —খেজুর গাছের অবশিষ্টাংশ গোড়া— আল্লাহ্‌র নবীর এই মহা সান্নিধ্য পেয়ে বড়ো গর্ববোধ করছিলাম। তিনি যখন আমার উপরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে অধিক সংখ্যক সাহাবীকে লক্ষ্য করে কথা বলতেন তখন আমার মনে হতো, আমি ধন্য, চিরধন্য! আগে ছিলো আমার সবুজ সবুজ পাতা, লম্বা লম্বা সবুজাভ শাখা! এখন আমার কিছুই নেই! শুকনো কাঠের মতো পড়ে আছি মাটি কামড়ে। তাতে কী হয়েছে! আমার মুহাম্মদ তো আছেন! তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য তো আছে! এখন তিনিই আমার শাখা! কোন্ শাখার জন্যে তবে এখন আমি শোক-তাপ করবো? হারিয়ে যাওয়া সেই

শাখার জন্যে, এই মুহাম্মদী শাখার বদলে? না, অসম্ভব! এ-ই আমার সবচে' প্রিয় 'শাখা'! আহা! কী যে ভালো লাগে আমার, যখন কথা বলার জন্যে নবীজী আমার উপর পা রেখে নিবিড় হয়ে দাঁড়ান, সাহাবীরা তা শোনার জন্যে আমার কাছে—আশ্‌পাশে নিবিড় হয়ে বসেন! সবাই তাকিয়ে থাকেন নবীজীর দিকে, তখন তো দৃষ্টি পড়ে যায় আমারও উপরে! এই সৌভাগ্য আমি কী দিয়ে মাপবো?

আমার সৌভাগ্য দিনে দিনে বাড়ছিলো, কেননা আমি দেখছিলাম যে মুসলমানদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে এক সময় এমন পর্যায়ে চলে গেলো যে আমার উপর দাঁড়ালে আল্লাহ্‌র রাসূলকে সবাই দেখতে পারতেন না। তাঁর কথা সবার কানেও পৌঁছতো না। ফলে তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন পাশে, আমার চেয়ে উঁচু একটা মিম্বরে! মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যে আমার আনন্দ যতো-না বাড়লো তারচে' বেশী বেড়ে গেলো আমার বিরহ-যাতনা! আল্লাহ্‌র নবী'র বিরহ আমি সইতে পারলাম না, পারলামই না। মনকে বোঝাই— তোমাকে তো ইচ্ছে করে মুহাম্মদ ছেড়ে চলে যান নি! প্রয়োজন হয়েছে, তাই গিয়েছেন! মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে, তাই গিয়েছেন! এ জন্যে অমন ভেঙে পড়লে-যে! তুমি কি যুক্তির ভাষা বোঝো না?! এখনও যদি তোমার উপর দাঁড়িয়েই নবীজী কথা বলেন, তাহলে অনেকেই-যে তাঁর বাণী শুনতে পাবেন না! অনেকেরই যে কষ্ট হবে! তোমার একার কষ্ট তোমার কাছে কষ্টদায়ক না আরো অনেকের কষ্ট বেশী কষ্টদায়ক!

কিন্তু মন আমার বুঝলো না। শান্ত হলো না। স্থির হলো না। না প্রবোধে, না যুক্তিতে! আমি নিজের উপর সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম! একদিন দেখলাম—
আমি না-চাইতেই কাঁদছি!
অঝরে কাঁদছি!
কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ছি!
যেনো একটা অবোধ শিশু কাঁদছে!
মা'কে খুঁজে খুঁজে না-পেয়ে!!
আমার বুক ফেটে কেবল উদগীরিত হচ্ছিলো—
'আহ্‌! আহ্‌!-এর লাভা!
এভাবে আমি 'আহ্‌! আহ্‌! আহ্‌!' বলে কেঁদে কেঁদে সারা!

বুকের জ্বলনে-দহনে চোখ আমার অবিরত শুধুই ভেজা ভেজা!
আমার এ কান্না—
ভালোবাসার কান্না!
নবী প্রেমের নাযরানা!
চুপ থাকি কেমনে?
নীরব থাকি কেমনে?
ভালোবাসবো না আমার নবীকে!
তাঁর ভালোবাসায় যদি আমার আঁখিজলে বুক ভাসে, ভাসুক না!
কেনো আমি থামবো?
কেনো আমি বলবো—
হে চোখ! শান্ত হও!
বন্ধ করো তোমার অশ্রুপাত!
না, এ আমি বলতে পারবো না! পারবোই না!
ভালোবাসার দাবি আমি ছাড়তে পারবো না!

তাই কান্নাও আমি বন্ধ করতে পারবো না!
আর এটা তো আমি পারবোও না!
কারণ এ-যে সম্পূর্ণরূপে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে!
আমি কাঁদছি ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়!
আমি কাঁদছি লোক-দেখানো কান্না নয়, নবীজীর ভালোবাসায়!
ভালোবাসার কান্না বন্ধ হয় না!
ভালোবাসার কান্না বন্ধ করা যায় না!
ভালোবাসার কান্না থামে না,
থামানো যায় না!
ভালোবাসার কান্না বাঁধ মানে না—চিরঅবাঁধ!
কিন্তু তাই বলে কি আমি কেঁদে কেঁদেই 'শেষ' হয়ে যাবো?!

হঠাৎ দেখলাম—
সাহাবীরা বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন।
অবাক চোখে!
তাঁরা কি আমার কান্না শুনতে পাচ্ছেন? মনে হয় পাচ্ছেন!
হ্যাঁ, তাঁরা আমার দুঃখ বুঝতে পারছেন!
তাঁরা আমার বিরহ-জ্বালা উপলব্ধি করতে পারছেন!
তখনো আমি 'আহ্! আহ্! আহ্!' করছি!
নিজেকে থামাতে পারছি না!
আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার এগিয়ে এলেন, আমার দিকে!
কাছে এলেন, অনেক কাছে!
একেবারে কাছে!
তারপর গভীর মমতায়,
অনন্ত স্নেহময়তায় আমাকে জড়িয়ে ধরলেন!
সান্ত্বনা দিলেন!
জান্নাতে আমি তাঁর পাশে থাকবো—
এ সুসংবাদও শোনালেন!

থামতে বললেন!
আমি থেমে গেলাম!
কেনো থামবো না?
এতোক্ষণ কেঁদেছি, সে তো বিরহের কান্না!
এখন তো বিরহ নেই! তার জ্বালাও নেই!
তবে কেনো আর কান্না?
মিলনে কি কাঁদতে আছে!
যার জন্যে এ কান্না,
তিনিই তো এখন আমার সান্ত্বনা!
তাই আমি শান্ত হলাম!
আমার অশান্ত প্রহর কেটে গেছে।
আমার বিরহ-কাতরতা আর নেই।
কেননা আমি আমার ভালোবাসার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি আমার প্রিয়ের কাছে—হাবীবের কাছে।
আমার জীবনে এখন আর কান্না নেই,
আছে শুধু হাসি।
সুখের হাসি।
আনন্দের হাসি।
তৃপ্তির হাসি।
পূর্ণতার হাসি।
ইতিহাসের সেরা খেজুর গাছ হওয়ার হাসি।
সেরা কেনো?
সেরা শুধু এ জন্যে যে আমি কাঁদতে পেরেছি।
আমার কান্না নবীজীকে,
তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে শোনাতে পেরেছি!
এমন কোনো খেজুর গাছ খুঁজে পাবে তুমি!
তবেই বলো, সেরা আমি! শুধুই আমি!!

আমি রিদওয়ান বৃক্ষ

জাযিরাতুল আরবে গাছ-গাছালি নেই বললেই চলে। হঠাৎ কোথাও দেখা যায় দু'একটি খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্বের ঘোষণা দিচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের —গাছ–গাছালির— অনেক কাহিনী জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে সে-সব কাহিনী। আমার নিজের কাহিনী বলার আগে আমার বোনেরটা প্রথমে বলি।

একদিন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের খবর ও গতিবিধি জানার জন্যে মদীনার একটু বাইরে এলেন। সেখানেই ছিলো আমার বোন—ঐ গাছটা। নবীজী তার ছায়ায় গিয়ে বসলেন একটু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে। খানিক পর সেখানে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এর মধ্যেই চুপিসারে সেখানে এক মুশরিক এসে হাজির। হাতে নাঙা তলোয়ার। তলোয়ার উঁচিয়ে সে বললো:
-বলো, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?
আল্লাহ্‌র রাসূল লোকটার হত্যা-হুমকিতে একটুও ভয় পেলেন না, মোটেই বিচলিত হলেন না বরং দৃঢ় ও শান্ত কণ্ঠে বললেন:
-আল্লাহ!
'আল্লাহ' শব্দ শুনতেই লোকটা ভয়ে থরথর কাঁপতে লাগলো। তার হাত থেকে তলোয়ারটা খসে পড়ে গেলো। আল্লাহ্‌র রাসূল তখন সেটি উঠিয়ে বললেন:
-বলো, তোমাকে এখন কে বাঁচাবে?
ভীত কম্পিত লোকটি লা-জওয়াব দাঁড়িয়ে রইলো। তার ভয় ও কম্পন ধীরে ধীরে
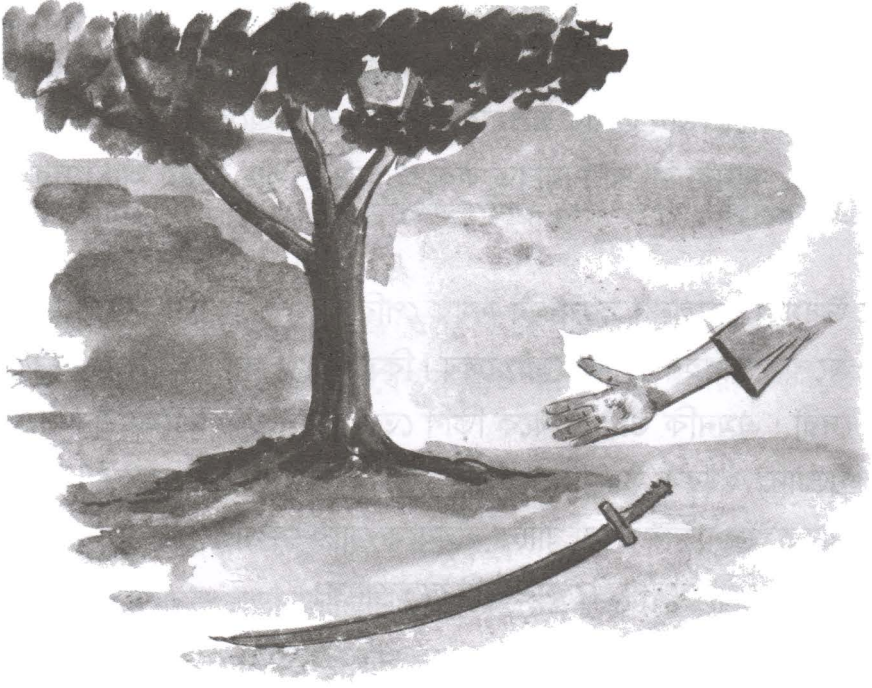
বাড়তে লাগলো। আল্লাহ্‌র রাসূল তাকে মাফ করে দিলেন। জানের দুশমনকেও তিনি ছেড়ে দিলেন। তার নাম ছিলো দা'সূর—دعثور। পরে সে মহানবীর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়।

✵ ✵ ✵

এই ছিলো আমার বোনের কাহিনী। এবার বলি আমার কথা। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার যে কাহিনী তা নিয়ে আমি হাজার বার গর্ব করি। এ গর্বের উৎস হলো, আমার কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন! আমি এখন স্মরণীয়, চির স্মরণীয়। জন্মেছিলাম মাটিতে—উষর মরুতে। তারপর নবীজীর পরশে উঠে গেলাম আকাশে, লওহে মাহফুযে—সংরক্ষিত ফলকে! কী সৌভাগ্য!!

হিজরতের পর অনেকদিন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীরা মক্কায় যান নি। যেতে পারেন নি। অথচ মন টানছিলো ভীষণ। দু' চোখ

ভরে মক্কা দেখার জন্যে কা'বা অবলোকন করার জন্যে সবার মন আঁকু-পাঁকু করছিলো। তাই একদিন সাহাবীদের নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল মক্কায় রওয়ানা হলেন। হোদায়বিয়া পৌঁছে তিনি হযরত উসমানকে মক্কার কাফেরদের নিকট এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, আমরা কা'বা যিয়ারত করতে এসেছি, যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

হযরত উসমান গেলেন। অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর সবাই তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গোনতে লাগলেন। কিন্তু উসমানের আসতে দেরী হচ্ছিলো, অনেক দেরী। এমনকি ওদিক থেকে তিনি তো এলেনই না, এলো এক দুঃসংবাদ, মহা দুঃসংবাদ! হযরত উসমানকে নাকি ওরা কতল করে ফেলেছে!! ভাবো তো একটু! হযরত উসমানের মতো মাটির মানুষকে মেরে ফেলার খবর এলে নবীজী এবং সাহাবীদের মনে কী বেদনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে!

সুতরাং এ-খবরে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্যে বাইয়াত নিতে ডাকলেন। সবাই বাইয়াত গ্রহণ করলেন 'আমার নিচে' বসে! আমার ছায়ায় বসে! এ-বাইয়াত ও আমাকে নিয়েই নাযিল হলো তখন এ আয়াত—

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

'অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলায় বসে তোমার কাছে যুদ্ধের শপথ নিচ্ছিলো।' -সূরা ফাতহ

মক্কার মুশরিকরা এ-বাইয়াতের কথা জানতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভিতরে ভীতি ও কম্পন ছড়িয়ে পড়লো। তারা ভালো করেই জানে, বীরপুরুষদের যুদ্ধ-শপথের অর্থ কী ! এদিকে একটু পর হযরত উসমান ফিরে এলেন। তাঁর কতলের খবরটি নিছক একটি গুজব ছিলো। হযরত উসমানের সঙ্গে কোরাইশের এক দূতকেও দেখা গেলো। দূত এসে বললোঃ

-আমরা চাই নতুন করে আমাদের মাঝে এখন আর কোনো যুদ্ধ না হোক। এ লক্ষ্যে আগামী দশ বছর আমাদের মাঝে একটি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি হবে। সে চুক্তিতে উভয় পক্ষের শর্তাবলী লেখা থাকবে।

চুক্তি সম্পাদিত হলো। ইতিহাসে যা 'হোদায়বিয়া চুক্তি' নামে পরিচিত। এ-চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো ছিলো এমন:

- আগামী দশ বছর উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে।
- এ বছর মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। উমরাও করতে পারবে না।
- হোদায়বিয়া থেকেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে মদীনায়।
- আগামী বছর উমরা করার সুযোগ থাকবে।
- তলোয়ার ও ধনুক ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধাস্ত্র সাথে আনা যাবে না।
- তিন দিনের মধ্যেই উমরা পালন করে সবাইকে মদীনায় ফিরে যেতে হবে।
- কোরাইশের কেউ মুসলমানদের কাছে চলে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে।
- মুসলমানদের কেউ কোরাইশের কাছে চলে এলে তারা তাকে ফেরত দেবে না।
- কেউ কারো মিত্রকে আক্রমণ করতে পারবে না।
- কারো মিত্রপক্ষ আক্রান্ত হলে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে।

সাহাবীদের অনেকেই এ-চুক্তিকে মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। কেননা এ চুক্তিতে অনেক অন্যায় শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছিলো। এতে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল সব শর্ত মেনে নিয়েই চুক্তি সই করলেন। সাহাবীদের দৃষ্টি ছিলো কাছে আর রাসূলের দৃষ্টি ছিলো দূরে, বহু দূরে। তাই সময় যতোই গড়াতে লাগলো এ-চুক্তির সুফল ততোই প্রকাশ পেতে লাগলো। আমার কাছেও তাই মনে হলো। দিনে দিনে নবীজীর দূরদৃষ্টি আলো ছড়াতে লাগলো। নমুনা লক্ষ্য করো—

এক.

চুক্তি অনুযায়ী মক্কা থেকে কেউ মদীনায় চলে এলে তাকে মক্কায় কোরাইশের কাছে

ফিরিয়ে দেয়ার কথা ছিলো। সে অনুযায়ী অনেককেই আল্লাহ্‌র রাসূল ইসলাম কবুল করে মদীনায় তাঁর কাছে চলে আসার পরও ফিরিয়ে দিলেন। মক্কায় চলে যেতে বললেন। কিন্তু এরা তো একবার ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। আলোর পথের যাত্রী হয়েছেন। তাঁদের বিবেকের চোখ খুলে গেছে। তাঁরা এখন আলোকে আলো আর অন্ধকারকে অন্ধকারই মনে করেন। তাঁদের কাছে ঈমান ও ইসলাম এখন আলো, শুধুই আলো আর কুফরি ও শিরক এখন অন্ধকার, কেবলই অন্ধকার। সুতরাং তাঁরা কেনো নতুন করে 'অন্ধকার জগতে' ফিরে যাবেন? অন্ধকারের বাসিন্দাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন?! কিন্তু এদিকে আল্লাহ্‌র রাসূল তো চুক্তি করেছেন যে, তাঁদেরকে তিনি নিজের কাছে রাখতে পারবেন না। সে হিসাবে মদীনায় থাকাও তাঁদের জন্যে সম্ভব হবে না এবং আল্লাহ্‌র রাসূলেরও তাঁদেরকে রাখা ঠিক হবে না। অগত্যা তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কার দিকে যেতেন ঠিকই, কিন্তু কোরাইশের কাছে যেতেন না, মক্কায়ও যেতেন না। তাঁরা বরং আশ্রয় নিতেন বিভিন্ন পাহাড়ে। কিংবা তাঁবু টানিয়ে বসবাস শুরু করতেন মক্কা মদীনার রাস্তার আশপাশে। আর সুযোগ পেলেই কাফির মুশরিকদের উপর আক্রমণ করতেন, ওদের বিশদাঁত উপড়ে ফেলতেন!

এভাবে তাঁদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। কোরাইশের জন্যে তাঁরা আতঙ্ক হয়ে উঠলেন। এদিকে কোরাইশ যে উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে ফেরত চাইছিলো, তা তো ব্যর্থ হলোই, যারা মক্কায় আছে তাদের ভিতরেও অনেকেই তাঁদের প্রভাবে ইসলাম কবুল করে কোরাইশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছিলো। তাই কোরাইশের এখন 'ছেড়ে দেয় মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। কয়েকদিন পরই তারা এ-শর্ত প্রত্যাহার করে নিলো। বললোঃ
-না, আমাদের কাছে আর কাউকে ফেরত পাঠাতে হবে না!

দুই.

শুধু এ শর্তই না, পূর্ণ চুক্তিটাই কাফির মুশরিকদের জন্যে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। ফলে তারা চুক্তি বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়লো, চুক্তি ভেঙে ফেললো। আরেকটু খুলে বলছি—

মসজিদে নববীতে বসে আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন সাহাবায়ে কেরাম। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলো আমর ইবনে সালেমের নেতৃত্বে বনু খোযা'আর এক প্রতিনিধি দল। দলপতি আমর ইবনে সালেম আল্লাহ্‌র নবীকে জানালেন:

-কোরাইশ-মিত্র বনু বকর আমাদের উপর রাতের আঁধারে আক্রমণ করেছে এবং বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে। আর মিত্র হিসাবে কুরাইশরা তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে ও লোক পাঠিয়ে গোপনে সাহায্য করেছে। অথচ তা হোদায়বিয়া সন্ধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এ-খবরে নবীজী যেমন দুঃখ পেলেন তেমনি ক্ষুব্ধ হলেন। আমর ইবনে সালেমকে তিনি বললেন:

-তোমরা নিশ্চিত থাকো, আমরা এর বদলা নেবো। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আমি দেখলাম দশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উপকণ্ঠে এসে শিবির স্থাপন করেছেন। আমার মন বললো, কোরাইশ কি পারবে এ-বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করতে? এরা তো বদরে ওহুদে খন্দকে শাণিত করে এসেছেন নিজেদের বীরত্ব! এরা এখন শুধু বীর না, মহাবীর! কোরাইশ যতো ভালোবাসে জীবনকে এরা তারচে' অনেক বেশী ভালোবাসে শহিদী মওতকে!

আমার ধারণাই ঠিক হলো। মক্কাবাসী এদের সাথে লড়াই করা ছাড়াই রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। বরং ভীত-কম্পিত হয়ে যে যেদিকে পারলো, ছোটে পালাতে লাগলো। আল্লাহ্‌র রাসূল বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন!

হ্যাঁ, তখন কেউ আমার কথা .. আমার নিচে বসে সেই বজ্র-কঠোর জিহাদী শপথের কথা ভুলে যান নি। কী দৃপ্তকণ্ঠে সেদিন তাঁরা উচ্চারণ করেছিলেন— হয় বিজয় নয় 'বিলয়'!

না বিলয় নয়, এলো আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়। মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। রাসূলের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে। বিজয়ী মুহাম্মদের দয়া-মায়া-

করুণা-মানবতা-উদারতায় প্লাবিত হয়ে। রাসূলের মক্কা প্রবেশকালীন ঘোষণা আওড়াতে লাগলো মানুষ—

রক্তপাত নিষিদ্ধ!

গাছ কাটা যাবে না!

এ-কথা শোনে আমার শাখা-প্রশাখারা দুলে উঠলো আনন্দে!

মর্মর ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো আমার পত্র-পল্লব!

হায় হায়! কী দয়ার নবী তুমি হে মুহাম্মদ!

একটু পর আমার কানে এলো আরেকটি মহা ঘোষণা!

হৃদয় আমার আনন্দে ব্যাকুল!

মাতোয়ারা!

মনে হলো; আমার সবগুলো মরা পাতা ঝরে গিয়ে এই মাত্র যেনো জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন কিশলয়!

এতো মায়া!

এতো দরদ তোমার কণ্ঠে হে মুহাম্মদ!

অমন সুন্দর করে নিজের জানের দুশমনের কাছে কে জানতে চায়? ...

তুমি চেয়েছো!

তুমিই চাইবে!

তুমিই তো চাইতে পারো!

এ তোমার ক্ষমতা, শুধু তোমার!

যখন কানে এলো তোমার এ মহা ঘোষণা—

-হে কোরাইশ সম্প্রদায়!

তোমরা আমার কাছে কেমন আচরণ আশা করছো!

তারা বললো:

-উত্তম আচরণ ছাড়া আর কিছুই না! আপনি যে চিরউত্তম!

তারপর তুমি কী বললে হে মুহাম্মদ! তুমি বললে তা-ই, যা শুধু তুমিই বলতে

পারো—হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছাড়া! বললেঃ
-যাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম, তোমরা মুক্ত!!

✹ ✹ ✹

আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এরপর ইসলামের বিভিন্ন অগ্রযাত্রার খবর শুনতে পেতাম। আমি এখানে দাঁড়িয়েই শুনেছি হযরত আবু বকর রা. -এর শাসনকালের অগ্রযাত্রার খবর। আরো শুনেছি হযরত উমর রা.-এর সময়কার বিজয়গাথার কথা।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব ভবিষ্যতবাণীই একে একে বাস্তবায়িত হতে লাগলো। রোম-পারস্য মুসলমানদের হাতে এলো। এই পরাশক্তিদ্বয়ের অহঙ্কার ও দাপট ধুলোয় মিশে গেলো। এ সব খবর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাচ্ছিলাম আমার দর্শনার্থীদের মুখে। আমার ছায়াতলে এসে এরা বসতো আর আমাকে সব জানাতো। এরা ছুটে আসতো আমার কাছে ব্যাকুলতা ও ভালোবাসা নিয়ে। আমার নিচে রাসূল বসেছেন। তাঁর সাহাবীরা বসেছেন। তাঁরা আমার নিচে বসে জিহাদের শপথ নিয়েছেন। আমার কথা কুরআনে আলোচিত হয়েছে— এ-সবই সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতো আমার কাছে ছুটে আসতে। ভীড় করতে। এই ভীড় দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। হযরত উমর ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন, সীমালঙ্ঘনের ভয়। তিনি আমাকে আমূল কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তাই হলো। আমাকে কেটে ফেলা হলো!

না, আমি কোনো ব্যথা পাই নি! ব্যথা পাওয়ার আছেই-বা কী! আমি নিজের স্বার্থে খুশি বা ব্যথিত হই নি কোনোদিন, হতে চাইও নি! আমি ব্যথিত হলে হয়েছি রাসূলের ব্যথায়.. সাহাবীদের ব্যথায়! আমি খুশি হয়েছি এবং হয়ে চলেছি ইসলামের অগ্রযাত্রায়! আজ ইসলামের সেই চারা গাছটি রূপ নিয়েছে বিশাল এক মহীরুহে! ছায়া দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে বরং কোটি কোটি মুসলমানকে, এ-ই আমার আনন্দ, এ-ই আমার গর্ব! আমি থাকলাম কি থাকলাম না— এটা কোনো বিষয়ই না! কুরআনে তো আমি আছি! যতোদিন কুরআন আছে ততোদিন আমি থাকবো। কুরআন থাকবে চিরকাল আমিও থাকবো চিরকাল। আহা! কুরআনের পরশ কী মজা!

বন্ধু, কুরআনকে ভালোবেসে বিলীন হয়ে যাও কুরআনে, আমার মতো! দেখবে, কী মজা!

আমার কাহিনী এখানেই শেষ। এখন তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— স্বর্ণমুদ্রা! বিদায় বন্ধুরা, ভালো থেকো!

আমি স্বর্ণমুদ্রা বলছি

আমি স্বর্ণমুদ্রা। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আমার পেছনে ছুটে চলেছে, লোভ-কাতর হয়ে। 'আরো চাই আরো চাই' লোভযন্ত্রে চালিত হয়ে। আমার ঝলমলানি মানুষকে যেনো যাদুস্পর্শে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। মাঝে মাঝে দেখি, আমাকে নিয়ে মানুষ যুদ্ধ পর্যন্ত বাধিয়ে বসে। কিছু কিছু মানুষ তো আমাকে অর্জন করতে সাদা-কালো বৈধ-অবৈধ— সব পথ বেছে নেয়। কেউ কেউ আবার আমাকে সঞ্চয় করে রাখে দিনের পর দিন। ওরা এভাবে ধনী হতে চায়। ধনই ওদের কাছে শেষ চাওয়া-পাওয়া।

কিন্তু স-ব মানুষের ভীড়ে এমন একজন মানুষকে আমি দেখেছি, যিনি আমাকে চান না, একেবারেই না। তাঁর কাছে আমার কোনো গুরুত্ব ছিলো না। হ্যাঁ, তাঁর দেখা পেয়েছিলাম আমি আজ থেকে প্রায় পনের শ' বছর আগে মক্কায়। মক্কার লোকেরা মূর্তিপূজা করতো। ওরা আমারো পূজা করতো। কিন্তু তাঁকে আমি কখনো মূর্তির সামনে যেতে দেখি নি, মুহূর্তের জন্যেও না। বরং মূর্তির প্রতি ছিলো তাঁর ভীষণ ঘৃণা ও অভক্তি। একবার চাচাজান আবু তালিব তাঁকে ছোট্ট বেলায় প্রায় জোর করেই মূর্তিখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মূর্তির নিকটবর্তী হতে পারেন নি। বড় মূর্তিটার আশ্‌পাশের ছোট মূর্তিগুলোর কাছে যেতেই তিনি দেখলেন সাদা পোশাকের একটা লোক চীৎকার করে বলছে, 'মুহাম্মদ! কাছে এসো না, জলদি পিছিয়ে যাও! এক্ষুণি বেরিয়ে যাও!'

✱ ✱ ✱

মক্কার মানুষ তাঁকে ভীষণ সমীহ্ করতো, ভালোবাসতো, বিশ্বাস করতো। মায়াভরে ডাকতো 'আল-আমীন' 'আল-আমীন' বলে। দেখলেই শ্রদ্ধাভরে বলতো, ঐ-যে মুহাম্মদ—আমাদের আল-আমীন! আল-আমীন সব কিছুতেই আল-আমীন—বিশ্বাসী— ছিলেন। কথায় ছিলেন বিশ্বাসী। কাজে ছিলেন বিশ্বাসী। জন-আচরণেও ছিলেন বিশ্বাসী। কখনো তিনি এমন দীনারের দিকে হাত বাড়ান নি, যা নিজের নয়। এ জন্যেই মানুষ তাঁর কাছে কতো দীনার, কতো সম্পদ আমানত রাখতো। তাঁর শত্রুরাও তাঁকে বিশ্বাস করে আমানত রাখতো। অনেকেই তাঁকে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগাতে চেয়েছে। আর এ-সবই তাঁর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার কারণে। তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে। যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ক'জনের ভাগ্যে জুটে?

সান'আ বলো আর দামেস্ক বলো কিংবা মক্কা, কোথাও জুড়ি ছিলো না আল-আমীনের বিশ্বস্ততার। কারো মাঝেই দেখা যেতো না অমন বিশ্বস্ততা। আল-আমীনের জুড়ি শুধু আল-আমীনই। এ জন্যেই বিবি খাদিজা তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন ব্যবসার কাজে। খাদিজার হয়ে গেলেন তিনি শামে। বয়ে আনলেন অনেক লাভ। খাদিজার জন্যে, নিজের জন্যে, চাচাজানের জন্যে।

খাদিজা তাঁর বিশ্বস্ততায় আশ্চর্য হলেন।

খাদিজা তাঁর গুণে মুগ্ধ হলেন।

মুগ্ধতার ঘোর-আবেশে এক সময় তিনি আল-আমীনকেই চেয়ে বসলেন!

নিজের জন্যে, একান্ত নিজের জন্যে!

অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী হয়ে ধন্য হওয়ার জন্যে!

আল্লাহু আকবার! বিশ্বস্ততার কী মিষ্টি ফল!

এ-বিবাহের কারণে আল-আমীনের জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। আকাশ থেকে যেনো বরকতের বৃষ্টি নেমে এলো। সে বর্ষণে সিক্ত হলেন চাচা আবু তালিব, হাসি ফুটলো তাঁর অভাবের সংসারে! চাচাজানের হাসিতে আল-আমীনের মুখেও হাসি ফুটলো! প্রিয় আল-আমীনের হাসিতে খাদিজার মুখেও হাসি ফুটলো! সব হাসির সম্মিলনে পৃথিবীও যেনো হেসে উঠলো! আর এ-সব হাসির উপর ঐ সুদূর আকাশ থেকেও যেনো বর্ষিত হলো পুষ্পময় হাসির হাজার হাজার রেণু! তাই বুঝি একদিন আরশ থেকেও সালাম এসেছিলো খাদিজাকে খোঁজে!

ধন্য তুমি হে মহিয়সী খাদিজা!

আল-আমীনকে চিনতে তুমি একটুও ভুল করো নি!

ধন দিয়ে, মায়া দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে তুমি আল-আমীনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে গেলে! তাই আল-আমীনের নাম উচ্চারিত হলেই এসে পড়ে তোমার নাম!! সত্যিই তুমি মহিয়সী!![১]

---

১. এই মহিয়সীকে নিয়ে আমার একটি কিতাব লেখার স্বপ্ন আছে। স্বপ্নটা যদি তাড়াতাড়ি বাস্তব হতো! -অনুবাদক

আল-আমীন আমাকে উপার্জন করতেন ঘামঝরা শ্রম দিয়ে। হালাল উপায়ে, বৈধ পথে। না, আমি আগেই বলেছি, আমার প্রতি তাঁর কোনো টান ও আকর্ষণ ছিলো না। কিছু মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যেই তাঁর এই শ্রম, এই খাটুনি। কিন্তু যখনই শ্রমের বিনিময়ে আমি তাঁর হাতে উঠে আসতাম, তখনই তিনি তা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করে ফেলতেন, হাতে রাখতেন না। সঞ্চয় তো করতেনই না। খরচের খাতেরও তাঁর অভাব ছিলো না।
আসলে সবারই টাকা খরচের খাত আছে। কিন্তু অনেক মানুষ হাতের টাকা খরচ করতে চায় না। মায়া লাগে। টাকার গায়ে হাত বুলাতে তাদের ভালো লাগে। টাকার দিকে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে তাদের আয়েশ লাগে। টাকা সঞ্চয়ের পেছনে ছুটোছুটি করতে করতে তাদের আশ্ আর মিটে না। কিন্তু মুহাম্মদ এমন ছিলেন না। টাকা হাতে এলেই খরচ করে ফেলতেন, উপযুক্ত খাতে। আল-আমীন বিনিময় না দিয়েও কোনো কিছু গ্রহণ করতে চাইতেন না। নমুনা দেখো—

যখন তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বন্ধু আবু বকর তাঁকে একটি উট উপহার দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বিনামূল্যে তা গ্রহণ করলেন না।

যখন তিনি মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন মসজিদ নির্মাণের জন্যে, পরিবারের থাকার ঘর বানানোর জন্যে একটা জায়গা তাঁর পছন্দ হলো, তাও তিনি বিনামূল্যে নিতে চাইলেন না।

উম্মতে মুহাম্মদীর এমন অনেক 'সদস্য'ই আমি দেখতে পাই চলতে ফিরতে যারা টাকার লোভে, টাকার খোঁজে আদর্শ বিকিয়ে দেয়, এমন কি মহা দৌলত— ঈমানটাও কেউ কেউ বিকিয়ে দেয়! দুনিয়ার তুচ্ছ মায়ায় পরকালের সওদা করে বসে— হাসতে হাসতে!
হায়রে উম্মতে মুহাম্মদী!
হায়রে লোভ!
হায়রে ক্ষমতার মোহ!

কেনো তোমাদের এতো মায়া,
কেনো তোমাদের এতো লোভ— এই পচা দুর্গন্ধযুক্ত টাকার জন্যে!

আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে অর্জন করার ব্যাপারে মোটেই মরিয়া ছিলেন না। যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু। এ জন্যেই তাঁর গৃহে অবস্থান করার সৌভাগ্য কক্‌খনো আমার হয় নি! তাঁর সাথে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এ-সব স্মৃতির কথা মনে পড়লে আজো আমি বিস্মিত হই, পুলকিত হই। এসো, তোমাদেরকে শোনাই সে সব স্মৃতির কয়েকটি টুকরো টুকরো কথা।

এক.

একবার যুদ্ধ-বিজয়ী সাহাবায়ে কেরাম মালে গণিমতের নব্বই হাজার দিরহাম নিয়ে এলেন তাঁর কাছে। এখানে আমিও ছিলাম। তিনি তা একটা চাটাইয়ের উপর রাখলেন। তারপর একে একে স-ব দান করে দিলেন, একটি দিরহামও নিজের জন্যে রাখলেন না! অন্যের উপর নিজের পরিবারকে প্রাধান্য দিলেন না। নিয়ে নয়— বিলিয়েই ছিলো তাঁর আনন্দ।

দুই.

একদিন তাঁর কাছে এক ফকির এলো। কিন্তু হাতে তখন কিছুই ছিলো না। তাই বলে তিনি তাকে ফিরিয়েও দিলেন না, দিতে পারলেন না বরং পাশে বসিয়ে রাখলেন। এই আশায় যে, হয়তো আল্লাহ কোনো ব্যবস্থা করবেন, পাঠিয়ে দেবেন কোনো দানশীল ব্যক্তিকে তাঁর কাছে, একটু পর। না হলে আরেকটু পর। কিন্তু কী আশ্চর্য! একটু পর আরো দু'জন এলো সাহায্যের জন্যে। সাহায্যপ্রার্থী জমা হয়ে গেলো তিনজন। কাউকেই দয়ার নবী ফিরিয়ে দিলেন না। সবাইকে বসতে বললেন। একটু পর আরেকজন এলেন! তিনিও কি প্রার্থী? না, তিনি তাঁর এক প্রিয় সাহাবী! এসে তাঁকে চারটি দীনার দিলেন তিনি! তারপর বিনয়-ধোওয়া কণ্ঠে অনুরোধ করলেন— যে-কোনো খাতে তা খরচ করার! আল্লাহ্‌র নবী তিনজনকে তিনটি দীনার দিয়ে দিলেন। আর আমি থেকে গেলাম তাঁর হাতেই। আনন্দে আমার মনটা ভরে গেলো।

আহা! নবীজীর স্পর্শ কী মধুর! কিন্তু নবীজী আমাকে বেশিক্ষণ হাতে রাখলেন না। সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন:

-কে নেবে এই দীনারটা?

কিন্তু কেউ সাড়া দিলেন না। কে সাড়া দেবেন! দিরহাম-দীনারের প্রতি কারো-যে লোভ নেই! অগত্যা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিয়ে গৃহে চলে গেলেন। এনে বালিশের নীচে রেখে দিলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। শুয়ে তো পড়লেন, কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। সারা রাত অস্থিরতায় এপাশ-ওপাশ করলেন। এভাবেই রাত কেটে গেলো। নতুন দিন শুরু হলো। তাঁর নতুন দিনের প্রথম কাজ ছিলো— একজন হাজাতমন্‌দকে (মুখাপেক্ষি ও অভাবী) খুঁজে বের করা তারপর আমাকে তার হস্তগত করা। তিনি তাই করলেন। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন!

তিন.

নবীজী ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী। স-ব শিখেছেন তাঁরা নবীজীর কাছে। স-ব সময় শিখেছেন। যখন সুযোগ এসেছে তখনই শিখেছেন। নবীজীর কাছে তাঁরা শিখেছেন— আমাকে ভালো না-বাসতে। আমাকে গুরুত্ব না-দিতে। আমার দিকে লোভ-কাতর দৃষ্টিতে না-তাকাতে। হাতে এলে আল্লাহ্‌র পথে, সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, জনস্বার্থে, মানবতার সেবায় বিলিয়ে দিতে।

হযরত উসমান রা.-এর একটি ঘটনা শোনো। একবার শাম থেকে মদীনায় এসে পৌঁছলো তাঁর বিশাল বাণিজ্য বহর। তখন মদীনায় খুব অভাব-অনটন চলছিলো। খাদ্য সঙ্কটে অনেকে কষ্ট পাচ্ছিলো। এদিকে খাবারের বাজার-মূল্যও ব্যবসায়ীরা বাড়িয়ে দিয়েছে। এক দীনারে আগে যা পাওয়া যেতো এখন তা কিনতে গেলে গোনতে হয় অনেক দীনার। ঐ বছরটিকে তাই ‘عام الرمادة’ বা দুর্ভিক্ষের বছর বলা হয়।

এই অবস্থায় হযরত উসমান রা. সবাইকে জমা করলেন। পাশেই স্তূপাকারে

রাখলেন সিরিয়া থেকে-আনা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য। তারপর তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন:

-তোমরা এর আগে যে-খাবার এক দীনার দিয়ে কিনতে এখন তা ক'দীনার দিয়ে কিনো?

তখন কেউ বললেন, দুই দীনার, কেউ বললেন, তিন দীনার।

হযরত উসমান রা. মৃদু হেসে বললেন:

-কিন্তু আমার পণ্যের মূল্য-যে অনেক বেশী, দশ গুণ! তোমরা কে কে তা কিনতে প্রস্তুত দশ গুণ মূল্য দিয়ে?

সবাই চুপ করে রইলেন, কেউ কথা বলতে পারলেন না। এতো মূল্য! কেমন করে তাঁরা পরিশোধ করবেন? এ-যে তাঁদের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে! অক্ষমতায় ও দুশ্চিন্তায় তাঁরা পেটের বেসামাল ক্ষুধা নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন হযরত উসমান রা.-এর হাসি-জড়ানো মুখের দিকে। একটু পর হযরত উসমান নীরবতা ভেঙে বলে উঠলেন:

-ভাইয়েরা আমার! আল্লাহ তো একটি নেক কাজের বিনিময়ে দশটি নেকী দান করেন, তাই না? শোনো, আমি স-বই সেই নেকী লাভের আশায় তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম!!

না, বিনিময়ে তিনি একটি দীনারও নিলেন না!

মানুষের ক্ষুধা-কাতর মুখ দেখেও কী করে তিনি মূল্য নিতে পারেন?

আল্লাহ কি তাঁকে কম দিয়েছেন?

কতো ধন দিয়েছেন! কতো বড় মন দিয়েছেন!

কেনো তবে তিনি অমন মন উজাড় করে হাত খোলে দান করবেন না?

অভাবী মানুষের মুখে প্রাপ্তি ও তৃপ্তির হাসি ফোটাবেন না?

মূল্য যদি নিতেই হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই নেবেন!

মানুষের মূল্য তো কম, অনেক কম!

এক দীনারের পণ্যে এক দীনারই পাওয়া যায়।

আল্লাহ্‌র কাছে পাওয়া যায় এক দীনারের পণ্যে শত শত গুণ বেশী,

সাতশ’ গুণ বেশী!
কখনো আরো অনে-ক বেশী!!
কোন্ ব্যবসাটা তাহলে লাভজনক?

কী সুন্দর শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন নবীজীর কাছ থেকে! যারা মানুষের তীব্র প্রয়োজনের মুহূর্তেও খাদ্য ও পণ্য আটকে রেখে মুনাফা লুটতে চায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র নবী তুলনা করেছেন এমন সব মানুষের সাথে যারা আমার পূজা করে! নবীজী বলেছেন- تعس عبد الدينار والدرهم —ধ্বংস হোক দীনার-দিরহামের পূজারী!

যেদিন আমি এ-হাদীস শুনেছি সেদিন থেকে আমিও আমার পূজারীকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। সত্যি তো ওরা হতভাগা! ওরা জানে না কাকে বলে আনন্দ ও সৌভাগ্য! কাকে বলে সফলতা, প্রকৃত সফলতা!

চার.

কী আর বলবো, জীবন আমাদের বড়ো অদ্ভুত। এই আনন্দ, আবার এই বেদনা। আমাদেরকে নিয়ে কিছু মানুষ মেতে ওঠে জঘন্য খেলায়। তখন আমরা বড়ো অসহায় বোধ করি, অস্বস্তি বোধ করি। আবার অপরদিকে আমরা যখন পুণ্যকর্মে ব্যয় হই, সত্যের পথে বিলীন হই, তখন আনন্দের আর সীমা থাকে না। এই-যে কখনো আমরা ভালো কাজে আবার কখনো মন্দ কাজে ব্যবহৃত হই, তার কিছু নমুনা দেখো:
আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই দীনারের ফাঁদে আটকানোর অপচেষ্টা করেছে কোরাইশ। তাঁকে লোভ দেখিয়ে বলা হয়েছে, তুমি সম্পদ চাও? হাজার হাজার দীনার আমরা তোমার পায়ের কাছে এনে রেখে দেবো! তবু তুমি এই নতুন ধর্মের প্রচারটা বন্ধ করো!
সাহাবায়ে কেরাম মালে গণিমত (যুদ্ধ-জয়ের পর দুশমনের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ) হিসাবে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পেশ করেছেন। কেউ কেউ আমাদেরকে পেশ করেছেন তাঁর কাছে খরচ করতে— নিজের

জন্যে, নিজের পরিবারের জন্যে। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নি। আমরা তাঁর হাতে যেতে চাইলেও তিনি আমাদেরকে নিতে চান নি। এখন না, তখন না, কক্খনো না। ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন:

-না হে আমার প্রতিপালক! আমি 'দিরহাম দীনার' চাই না। একদিন খাবো আরেকদিন খাবো না। যেদিন খাবো না সেদিন সবর করবো। যেদিন খাবো সেদিন তোমার শোকর করবো!

পাঁচ.

আল্লাহ্‌র নবী সারা জীবনই সম্পদ-নিস্পৃহ (সম্পদের প্রতি নির্লোভ, নির্মোহ, অনাগ্রহী) ছিলেন। জীবনের বেলা শেষে সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন:

-কে কী পাবে তোমরা আমার কাছে? এই-যে আমার সম্পদ! এখান থেকে নিজেদের পাওনা নিয়ে যাও!

একজন দাঁড়িয়ে বললেন:

-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার কাছে তিনটি দিরহাম পাই!

নবীজী সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করে দিলেন।

সেদিনের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন প্রচণ্ড অসুস্থ। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশার হুজরায় তিনি শুয়ে আছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন:

-আয়েশা! ঐ দিরহামগুলো কী করেছো?

-কোন্ দিরহামগুলোর কথা বলছেন?!

-ঐ-যে ছয়টা দিরহাম!

-সেগুলো আমার কাছেই আছে!

-মুহাম্মদ কেমন করে নিজের রব-এর কাছে যাবে, এই দিরহামগুলো নিজের কাছে রেখে! জলদি তুমি তা দান করো!

-অবশ্যই আমি তা দান করে দেবো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

-হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচিয়ে রাখো নিঃসম্বল! মৃত্যুও দাও নিঃসম্বল! আর হাশরের মাঠেও আমি হতে চাই নিঃসম্বলদের দলে!

আল্লাহ নবীজীর দু'আ কবুল করেছেন। তাই তো দেখি— মৃত্যুকালে রেখে যান নি তিনি একটি দীনারও .. একটি দিরহামও! যা কিছু রেখে গেছেন তার একটা তালিকা দেখবে? দেখো— !

- সামান্য যব, হযরত আয়েশার কাছে।
- সেই সাদা গাধাটি, যাতে সওয়ার হতেন তিনি।
- একখণ্ড জমি, তাও দান করে গিয়েছিলেন মুসাফিরদের জন্যে।
- তাঁর অস্ত্রটি।

এদিকে তাঁর বর্মটি তখন বন্ধক ছিলো এক ইহুদীর কাছে, নিজের জন্যে এবং পরিবারের জন্যে সামান্য খাবারের বিনিময়ে।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই নবীজীর কাছে শিখেছেন— এই দুনিয়ার জীবন আসলে কোনো জীবনই না। আসল জীবন তো শুরু হবে পরকালে। যার সূচনা আছে কিন্তু শেষ নেই। সেখানকার জীবন অমর অক্ষয়! চিরঅব্যয়! জান্নাতের নায-নেয়ামত ও হুর-গিলমানরা কেবলই হাতছানি দিয়ে ডেকে চলেছে অবিরত— চির-জীবনের চির সবুজ জান্নাতে!

অমন জান্নাতের অবিরাম হাতছানি যাঁদের কানে বাজে ,
তাঁরা কেমন করে আমি দীনারের প্রেমে মজে?
অর্থ-সম্পদের মায়ায় জড়ায়?
দুনিয়ার মরীচিকাময় পথে পা বাড়ায়?
দিরহাম-দীনারের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়?
পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে পথ হারায়?

ছয়.

আল্লাহ্‌র নবী একদিন মেয়ে ফাতেমাকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর হাতে স্বর্ণের একটা হার। পাশে-বসা এক মহিলাকে তিনি সেটি দেখিয়ে বলছেন— আবুল হাসান আমাকে এটি উপহার দিয়েছেন!

আল্লাহ্‌র নবী তখন বললেন:

-ফাতেমা! তুমি কি খুশি হতে পারবে, মানুষ যখন বলবে— আল্লাহ্‌র রাসূলের মেয়ের হাতে জাহান্নামের 'শেকল'!

এরপর নবীজী মেয়ের কাছে আর বসলেন না, বেরিয়ে গেলেন। হযরত ফাতেমা বুঝলেন, সব বুঝলেন। তিনি আর দেরী করলেন না, স্বর্ণের হারটি বিক্রি করে দিলেন। মূল্য দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করলেন। তারপর সেই গোলামটিকে আযাদ করে দিলেন।

আল্লাহ্‌র নবী এ-খবর শুনলেন, ভীষণ খুশি হলেন। বললেন:

-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি ফাতেমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন!

আল্লাহ্‌র নবীর মুখে উচ্চারিত হতো:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا.

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের পরিবারের রিযিক বরাদ্দ করো শুধু ততোটুকুই, যতোটুকুতে তাদের প্রয়োজন সেরে যাবে, একটুও বেশী হবে না!

আমি ইসলামের পতাকা

কখনো আমি কাপড়ের তৈরী। কখনো কাগজের। কখনো একটিরও না। আমি ইসলামের পতাকা—
এটিই আমার আসল রূপ।
এটিই আমার আসল পরিচয়
এটিই আমার আসল ছবি।
এ-রূপেই আমি রূপময়।
এ-ছবিতেই আমি ছবিময়।
সত্যিকারের ইসলামই আমার জীবন, যে ইসলামের পয়গাম শুনিয়ে গেছেন পৃথিবীর মানুষকে সায়্যিদুল মুরসালিন (সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল), খাতামুন নাবিয়্যিন (সর্বশেষ নবী)।

আমার জীবনে আছে কিছু অবিস্মরণীয় ঘটনার মধুময় স্মৃতি। ইতিহাসের পাতায় সে সব লেখা আছে নূরের হরফে—স্বর্ণাক্ষরে। যে শহরের উদার আকাশে আমি প্রথম উড়েছি, পতপত করে ইসলামের জয়যাত্রার ঘোষণা দিয়েছি, সে আকাশটা হলো ইয়াসরিবের আকাশ। পরবর্তীর্তে যে ইয়াসরিবের নাম বদলে হয়ে যায়— মদীনাতুর রাসূল—রাসূলের শহর—মদীনা মুনাওয়ারা। তখন সেখানে এসে আশ্রয় নেন ঈমান নিয়ে, ইসলাম নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম। কোরাইশের অমানবিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে। তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে। আমি মদীনার আকাশে তখন পতপত করে ওড়ছিলাম
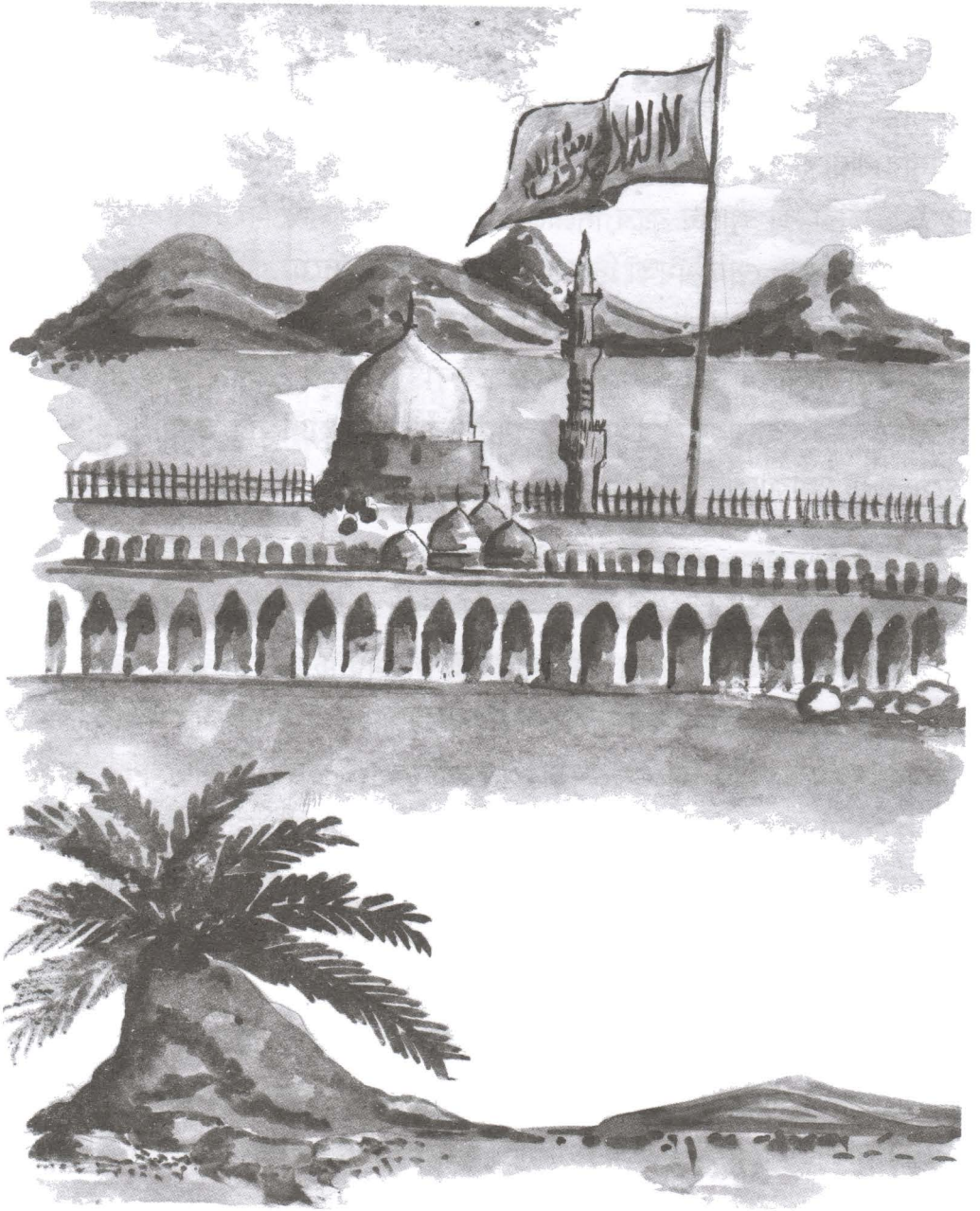
আর আনন্দে আকাশের নিঃসীম নিলীমায় তাকিয়ে তাকিয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করছিলাম।

আহা! মদীনার মানুষের কী মায়া!

মদীনার আকাশের কী ছায়া!

মদীনার পরিবেশের কী দয়া!

মুহূর্তেই তাঁরা কী আপন করে নিয়েছেন মক্কা থেকে-আসা মুহাজির ভাইদেরকে! ভালোবাসা দিয়ে, স্নেহ-মমতা দিয়ে, সম্পদ-সহায়তা দিয়ে! কী নিবিড় টানে সবাই একজন করে মুহাজিরকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন! আল্লাহ্‌র নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভাই হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন! এভাবেই তাঁরা 'আনসার' হয়ে গিয়েছিলেন— আল্লাহ্‌র কুরআনের ভাষায়! রাসূলের হাদীসের ভাষায়! ক'জনের ভাগ্যে জুটে 'আকাশের উপাধী'?

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যে লড়াইটা বদর-প্রান্তরে হয়েছিলো সেখানে আমিই ছিলাম পতাকা। বদরের আকাশে পতপত করে আমি সেদিন ওড়ছিলাম আর ইসলামের মহিমা প্রকাশ করে যাচ্ছিলাম। ইসলামের চিরন্তনতা ও বিশ্বজনীনতার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেদিন বীর লড়াকুরা আমাকে —ইসলামের পতাকাকে— উড্ডীন রাখতে বীর-বিক্রমে লড়াই করেছিলেন। রক্ত দিয়েছিলেন। জীবন দিয়েছিলেন। আর মাটির এই বীরদের সাহায্য করতে নেমে এসেছিলেন আসমানের 'বীররা'ও! ফলে মক্কার অহঙ্কারী কাফির মুশরিকদের পরিণতি যা হওয়ার তাই হলো, তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। বাঘা বাঘা নেতারা নিহত হলো। ওদেরকে 'ক্বালীব' কূপে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো। আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের সরাসরি অংশগ্রহণে অর্জিত এ-বিজয়ে মুসলিম বাহিনী আমাকে ঊর্দ্ধাকাশে তুলে ধরে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর অযুত-নিযুত গুণগানে মুখর হয়ে উঠলেন। আমি বদরের আকাশে পতপত করতে লাগলাম— আনন্দে আবেগে উত্তেজনায়।

ওহুদ যুদ্ধেও আমি পতপত করে ওড়ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মুসলিম শিবিরে সাময়িক বিপর্যয় নেমে এলে আমি প্রায় উল্টে যেতে বসেছিলাম। কিন্তু বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে

মুসলমানরা বেশী সময় নিলেন না, আবার তাঁরা সংঘবদ্ধ হলেন। রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। আমার মর্যাদা রক্ষা করলেন।

খন্দকেও আমি হুমকির মুখে পড়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্র সাহায্যে হুমকি দূর হয়ে গেলো। মুসলিম বাহিনীর অশ্রুময় মুনাজাত এবং রক্তময় প্রতিরোধে কাফেররা পালিয়ে গেলো। আমি সমহিমায় সগৌরবে আবার মদীনার আকাশে উড়তে লাগলাম। আমার নিচে এসে আশ্রয় নিতে লাগলো প্রতিদিন নতুন নতুন মুখ, ঈমানের নূরে নূরানি হয়ে। জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে। নবীজীর সান্নিধ্যের পরশে ঝলকিত হয়ে।

কিন্তু বন্ধু, মক্কা বিজয়ের সময় আমি মক্কার আকাশে .. কা'বার কাছে কেমন করে ওড়ছিলাম? ওহ্! সে কথা বলতে আমি একেবারে মুখিয়ে আছি! কিন্তু কোন্ ভাষায় বলি? সেদিন সত্যি আমি ছিলাম গর্বিত, আনন্দ-বিহ্বল! নিজের চোখে দেখেছি নবীজীর বিজয়। মহা বিজয়। আরো দেখেছি কেমন করে তিনি মক্কার এইসব 'জানি দুশমন'কেও কী আকাশ-উদারতায় মাফ করে দেয়ার মহা ঘোষণা দিলেন! আমি তাঁর এই মহত্ত্বে তাঁর এই উদারতায় আরো জোরে জোরে পতপত করে উড়তে লাগলাম! মক্কায় সেদিন ভূলুণ্ঠিত হলো প্রতিমাপূজার অভিশপ্ত পতাকা। ছিলাম শুধু আমি একা, শুধুই একা! এরপর আর কোনোদিন মক্কায় প্রতিমা আর প্রতিমাপূজারীদের ঠাঁই হয় নি। কোনোদিন হবেও না!! প্রতিমাপূজারীরা সেখানে আর কোনোদিন ঢুকতেই পারবে না।

মক্কা বিজয়ের পর এক বছর পেরুতে-না-পেরুতেই আমি জাযিরাতুল আরবের সবখানে উড়তে লাগলাম। দলে দলে তখন মানুষ আল্লাহ্র রাসূলের কাছে এসে ঈমান কবুল করে ধন্য হচ্ছিলো। আমার ছায়ায় এসে জড়ো হচ্ছিলো। যেনো প্রবল বেগে এক স্রোতধারা বয়ে চলছে। এই স্রোতধারার মোহনা ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হ্যাঁ, এই মোহনায় এসে সবাই আছড়ে পড়তে লাগলো। জীবনের আশায়। মুক্তির আশায়। আলোর খোঁজে। চিরকালীন জান্নাতের 'লোভে'। ক্ষণকালীন দুনিয়ার স্বার্থ ও লোভকে 'চিরবিদায়' বলে।

হিজরী দশম বছরের কথা বলি। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন আবার মক্কায়। আগে এসেছিলেন মক্কা বিজয় করতে এখন এলেন মক্কায় হজ্ব করতে। কা'বা তাওয়াফ করতে। সাফা-মারওয়া সাঈ করতে। আরাফায় 'ওকূফ'—অবস্থান করতে। মিনা-মুযদালিফায় ছুটে যেতে। জামারায় শয়তানকে পাথর মারতে। তৃপ্তিভরে জমজম পান করতে। আমি তাঁর শেষ ভাষণের সময়—বিদায় হজ্বের ভাষণের সময় পতপত করে ইসলামের মহিমা ও গৌরবগাথা ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম আকাশের নিঃসীমতায় .. মহা শূন্যতায়। আমার আনন্দের তখন কোনো সীমা ছিলো না। যদিও সেদিন প্রিয় নবীর কথায় বারবার বিরহের সুর বেজে উঠছিলো, তবুও লক্ষাধিক সাহাবীর মাথার উপরে আমার উড়তে পারা পেছনের সব আনন্দকে বুঝি ম্লান করে দিলো! আহা, কী আনন্দ! মক্কা থেকে মাত্র দশ বছর আগে-না আল-আমীনকে সঙ্গোপনে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো— ঈমান নিয়ে, আমল নিয়ে! আজ এখানে দশ বছর আগের সেই নিষ্ঠুরতাকে হার মানিয়ে কী ছায়া, কী মায়া! কী দরদ-ভালোবাসা!

আরো কতো স্মৃতি এখন আমার মাঝে তোলপাড় করছে! আমাকে নিয়ে বাঁকে বাঁকে ঘুরছে! কোথাও বা থমকে দাঁড়াচ্ছে! শহীদানের কবরের পাশে অশ্রু ফেলছে! আমি নবীজীর কাছ-ছাড়া হই নি মুহূর্তের জন্যেও। যেখানে তিনি গেছেন সেখানে আমিও গেছি। হোক তা জিহাদের ময়দানে কিংবা কা'বার আঙ্গিনায়। আমি জানি— কেমন ছিলো তাঁর সকাল-সন্ধ্যা ও দিবস-রজনী! আমি দেখেছি তাঁর আমল। আমি শুনেছি তাঁর কথা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে— তিনি ছিলেন মহান, সবকিছুতে মহান। তিনি ছিলেন মহা মানব। সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। বিশ্বস্ত পথিকৃৎ। কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত। অকৃত্রিম জনদরদি। বীর সিপাহসালার। শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতুলনীয় দাতা। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ। মানবিকতার পূর্ণ আধার। অদ্বিতীয় ভদ্র সভ্য মার্জিত অভিজাত। না, এভাবে গোনে গোনে আমি তাঁর অফুরন্ত গুণভাণ্ডার ফুরোতে পারবো না। বরং আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে এক কথায় যেমন স-ব বলে দিয়েছেন— এখন সে বাণীই আমি তিলাওয়াত করছি আনন্দোদ্বেল কণ্ঠে—

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

আমি তাঁকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম। যেমন অন্যরা তাঁকে ভালোবাসেন। হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। জীবন দিয়ে ভালোবাসেন। নিজের চেয়ে ভালোবাসেন। পরিবার-পরিজন— সবার চেয়ে ভালোবাসেন।

বিদায় হজ্বের পর একেকটি দিন যাচ্ছিলো আর মুসলমানদের সংখ্যা কী মজা কেবলই বাড়ছিলো। দলে দলে ছুটে আসছিলেন আলোর সন্ধানীরা। এসে এসে দিয়ে যাচ্ছিলেন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা। এ যেনো এক উৎসব— আঁধার থেকে আলোয় ফিরে আসার। তাঁরা আবেগ-প্লাবিত কণ্ঠে নবীজীর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন। সবখানে ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার শপথ করছিলেন— আমাকে —ইসলামের পতাকাকে— চির উন্নত রাখতে।
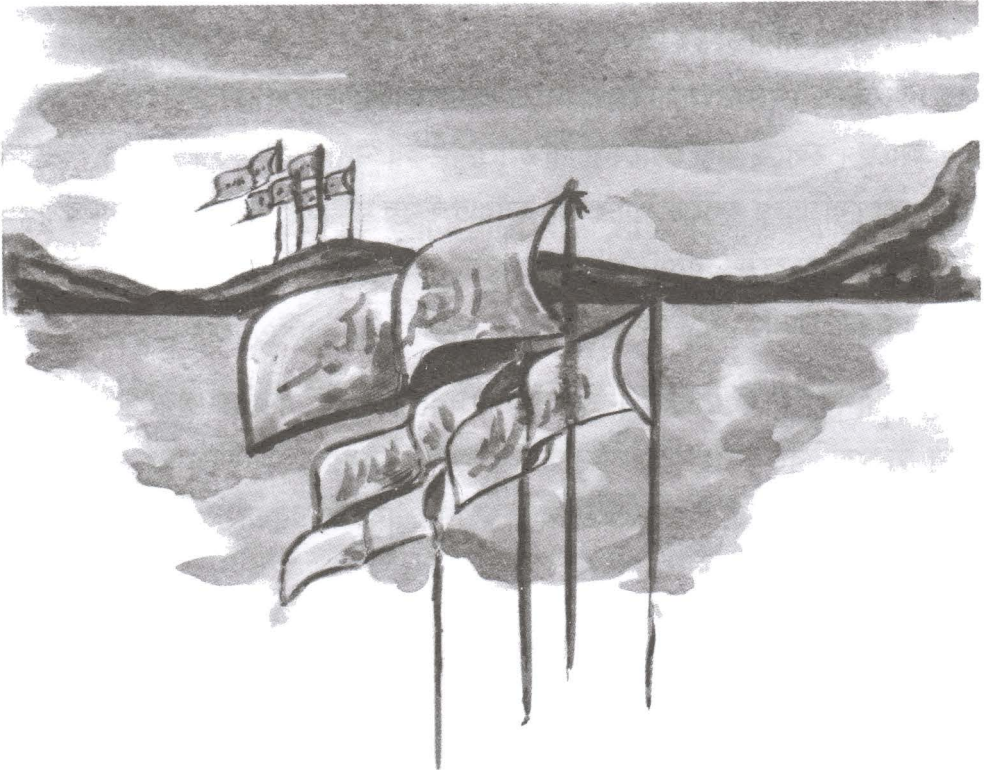
তারপর এলো সেই দিনটি। আমার জীবনের সবচে' কালো দিনটি। সবচে' শোকের দিনটি। সবচে' অশ্রুময় দিনটি। আমি যেনো কাঁপতে ভুলে গেলাম। আমি যেনো পতপত করতে ভুলে গেলাম। আমার কাছে যখন পৌঁছলো এই মহা শোকবার্তা—নবীজী আর নেই, তখন মনে হলো, আমি যেনো নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছি! আমি শোক-স্তব্ধতায় বিমূঢ় হয়ে গেলাম!

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না!

আমার মতো অন্যরাও শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন! হযরত উমর রা. তো শোকের আতিশয্যে নবীজীর ওফাতকে মানতেই পারলেন না, তরবারি উঁচিয়ে ঘোষণা দিলেন:

-যে বলবে মুহাম্মদ নেই, আমি তাকে আস্ত রাখবো না!

সাহাবায়ে কেরাম সবাই শোকে মুহ্যমান। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পিতৃহারা এতিমের বোবা দৃষ্টি নিয়ে সবাই তাকিয়ে আছেন। কেউ কেউ অঝরে কেঁদে চলেছেন। একটা কঠিন শোকাবহ পরিস্থিতির ভিতরে সময় যেনো আটকে আছে। পৃথিবী যেনো থমকে আছে। সূর্যটাও যেনো অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হতে ভুলে গেছে। স-বই যেনো থেমে আছে। চলছে শুধু শোকের গতি। শোকের নদী। শোকের বন্যা। কিন্তু এ অবস্থা তো বেশিক্ষণ চলতে পারে না! হযরত উমর রা.-এর মতো নতুন করে কেউ যদি শোক-পরাস্ত হয়ে তরবারি খাপমুক্ত করে বসেন? উমরের এমন হলে অন্য কারো এমন হবে না কেনো? হতেই পারে!

এ শোক-সাগর থেকে শোক-ডুবন্ত সাহাবীদেরকে উদ্ধার করতে অবশেষে এগিয়ে এলেন সবচে' বড় সাহাবী সিদ্দীকে আকবার—হযরত আবু বকর রা.! তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে, বিশেষত উমর রা.-এর শোক-কাতরতা ভেঙে দিতে ঘোষণা করলেন—

يَا أَيُّها النَّاسُ! مَنْ كانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فإنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. و مَنْ كانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإنَّ اللهَ حَيٌّ لا يَمُوْتُ.

হে লোকেরা! যারা মুহাম্মদ-পূজা করতে তারা কান খুলে শোনো— মুহাম্মদ চলে গেছেন! আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো তাদেরকে বলছি— আল্লাহ্‌র কোনো মৃত্যু নেই. তিনি চিরন্তন চিরঞ্জীব।

এরপর তিনি এ-আয়াত পড়লেন—

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِين ﴾

'আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত: কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।'
-সূরা আলে ইমরান।
এই আয়াত শোনে হযরত উমরের ঘোর কাটলো। তিনি বললেন:
-মনে হচ্ছিলো আমি যেনো কখনো এই আয়াত তিলাওয়াত করি নি!

ধীরে ধীরে শুকিয়ে এলো শোক-নদী। ধীরে ধীরে শান্ত হলো সবার অশান্ত মন। নবীজী চলে গেছেন কিন্তু তাঁর কাজ তো রেখে গেছেন! এই নবীওয়ালা কাম— কে আদায় করবে সবাই এগিয়ে না-এলে? সবাই এগিয়ে এলেন। পরবর্তী খলীফা মনোনীত করলেন। তিনি আর কেউ নন— গারে সাওরের সাথী হযরত আবু বকর রা.! হযরত আবু বকর খিলাফতের দায়িত্ব নিয়েই নবীজীর রেখে যাওয়া কাজ একে একে আঞ্জাম দিয়ে যেতে লাগলেন। সবার আগে উসামা বিন যায়দের নেতৃত্বাধীন সেনাদলকে তিনি সিরিয়া পাঠিয়ে দিলেন। ওফাতের আগ মুহূর্তে নবীজীই এই বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন।
এদিকে নবীজীর ওফাতের পর মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা বেশ গোলমাল শুরু করে দিলো। তারা দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করে পূর্ব-ধর্মে ফিরে যেতে লাগলো। কেউ-বা যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। কেউ-বা আবার নিজেকে নয়া

নবী বলে দাবি করে বসলো। এরা—এই জোটবদ্ধ মুরতাদরা—আমাকে —ইসলামের পতাকাকে— নীচে নামিয়ে ফেলার জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দিলো। কিন্তু আমি তো চির উন্নত। নত হতে ঊর্দ্ধমুখী হই নি! তাই যে যে-করেই আমার পতন চাইলো, তাদের চাওয়া চাওয়াই রইলো, আমি যেমন ছিলাম উন্নত, তেমনি আছি উন্নত। আমি চির উন্নত 'শির'! নবীজীর ওফাতের পর তাই দুশমনের চাওয়া আর পাওয়া হলো না। আমি উড়তে লাগলাম পতপত করে মক্কায় মদীনায়—সবখানে! মহাবীর খালিদের হাতে আমি পৌঁছে গেলাম এক শহর থেকে আরেক শহরে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে। এমন করেই আমি আরো ছড়িয়ে পড়লাম দেশে দেশে, ইসলামের মহিমা ছড়াতে ছড়াতে। কখনো হযরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা.-এর হাতে। কখনো সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর হাত ধরে। কখনো আমর ইবনুল আ'স রা., উসামা বিন যায়দ রা.সহ আরো অসংখ্য বীর সেনাপতির হাত ধরে। এভাবে যেতে যেতে রোম পারস্যের আকাশকেও আমি স্পর্শ করেছি। ইসলামী বিজয়ধারা যেদিকে ছুটে গেছে সেদিকেই আমি ছুটে গিয়েছি। আন্দালুস ও চীনের আকাশও তন্ময়চিত্তে দেখেছে আমার আনন্দোদ্বেল কম্পন! বর্তমানে আমার ছায়ায় যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের সংখ্যা সাতশ মিলিয়ন! এ সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছেই। বাড়বেই। আমার ছায়া অনেক বড়! অনেক শীতল! অনেক মায়াময়!

সমাপ্ত

ইসলামী শিশু-সাহিত্যের সৃজনশীল প্রকাশনী
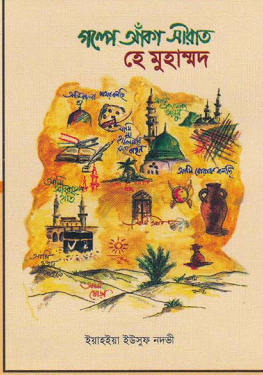
GOLPE ANAKA SIRAT HE MOHAMMAD

(Life of Mohammad by Story)

গল্পে আঁকা সীরাত হে মুহাম্মদ

'গল্পে আঁকা সীরাত ঃ হে মুহাম্মদ' ইতিহাসের কোনো কিতাব নয়। তথ্য ও তত্ত্বের ভারে ন্যুব্জ কোনো গবেষণাগ্রন্থও নয়। বরং এ-কিতাব হলো প্রিয় নবীর জীবনের উপর আলো ঝলমলে একটি উপস্থাপনা— নির্ঝর-প্রবাহের মতো ঝরঝরে গদ্যে। প্রিয় নবীর জীবনকে এখানে চিত্রিত করা হয়েছে চিত্তাকর্ষক গল্পের মায়াবি ভাষায়। এ-কিতাব সীরাতে নববীর উপর রচিত শিশু-সাহিত্যের এক অভিনব, পুলক-জাগানিয়া, প্রাণ-মাতানিয়া বিস্ময়কর সৃষ্টি। পড়তে শুরু করলে মনে হবে— এই-যে আমি আমার নবীকে ভালোবাসার মসৃণ পথ ধরে কী সুন্দর এগিয়ে চলেছি! কী আশ্চর্য! আবরাহার হাতিটি এতো সুন্দর বলতে পারে! মা হালিমার গাধীটি-যে আরো বাগ্মী, কী আবেগঘন ভাষা! কালো পাথর কী সুন্দর করে বলে চলে নিজের কথা! কবুতর যেনো তরতর বয়ে চলা এক নদী! উম্মে মা'বাদের বকরীটির কথা যেনো আনন্দোদ্বেল কোনো কবির উচ্ছ্বাসগাথা! ....

এভাবে জীব-জন্তু-গাছ-পাথর হয়ে ওঠে নবীজীর ভালোবাসায় কী আবেগ মথিত!

এ-কিতাবে লুকিয়ে আছে আরো অনেক অজানা মজা! সব কি আর যায় বলা? তুমি বরং ভিতরে প্রবেশ করো, নিজেই যাচাই করো! তোমাকে স্বাগতম!

ISBN 984-7 0364-0006-7